হিন্দুধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী
প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
বিষ্ণু দাশ
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার
ড. শিশির মল্লিক
শিখা দাস

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে প্রণীত মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ শ্রেণির **হিন্দুধর্ম শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধানসমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দুধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের নৈতিক গুণাবলি যেমন– সততা, উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	১—৮
দ্বিতীয়	ধর্মগ্রন্থ	৯—২০
তৃতীয়	হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস	২১—৩৩
চতুর্থ	নিত্যকর্ম ও যোগাসন	৩৪—৪৩
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ	৪৪—৫৩
ষষ্ঠ	ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা	৫৪—৬২
সপ্তম	আদর্শ জীবনচরিত	৬৩—৭৯
অষ্টম	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ	৮০—৯২

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

কোনো কিছু সৃষ্টির জন্য একজন স্রষ্টার প্রয়োজন হয়। স্রষ্টা ছাড়া কোনো কিছুর সৃষ্টি হয় না। এ মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের সবকিছু অর্থাৎ মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি এক-একটি সৃষ্টি। এ সকল সৃষ্টির একজন স্রষ্টা রয়েছেন। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি। আমরা তাঁকে ঈশ্বর নামে ডাকি। তাঁর অনেক নাম– ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, ভগবান, আত্মা ইত্যাদি। তিনি প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই আমরা জীবের সেবা করব। জীবসেবাই আমাদের পরম ধর্ম। জীবসেবার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি। এ অধ্যায়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, সকল জীবের মধ্যে স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত একটি সংস্কৃত মন্ত্র বা শ্লোক বাংলা অর্থসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- সকল জীবের মধ্যে স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর সম্পর্কিত একটি সহজ সংস্কৃত মন্ত্র বা শ্লোক সহজ অর্থসহ বলতে পারব এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে জীবসেবায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবো।

পাঠ ১ : স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা

এই পৃথিবী বড় সুন্দর ও বিচিত্র। এখানে রয়েছে মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মরু-প্রান্তরসহ আরও কত রকমের বিচিত্রতা। পৃথিবীর উপরে রয়েছে সুনীল আকাশ। আকাশে বিরাজ করছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, ছায়াপথ ইত্যাদি।

এই পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। সে নিজের প্রয়োজনে অনেক কিছু তৈরি করতে পারে, যা অনেক জীবই পারে না। যেমন- সহজেই একজন কাঠমিস্ত্রি কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু অন্য প্রাণীরা তা করতে পারে না। এই চেয়ার, টেবিল, নৌকা ইত্যাদি তৈরির জন্য কাঠের প্রয়োজন।

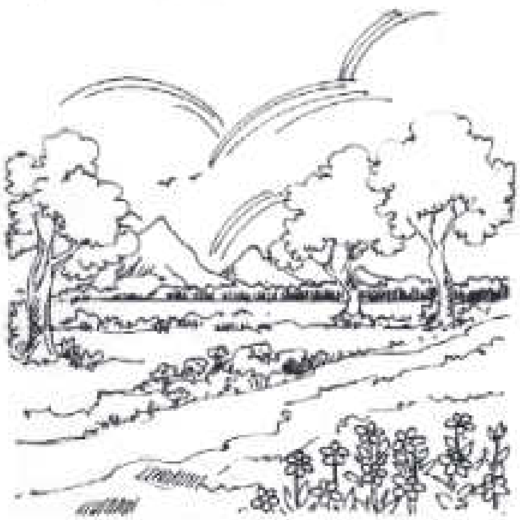

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- কাঠ কীভাবে তৈরি হয়েছে? উত্তরটা খুবই সহজ। গাছ কেটে কাঠ প্রস্তুত হয়েছে এবং কাঠ থেকে তক্তা তৈরি করে নৌকা বানানো হয়েছে। এর পরের প্রশ্ন- গাছ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কে সৃষ্টি করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা যাক।

আমরা আগেই বলেছি, সকল সৃষ্টির মূলে একজন স্রষ্টা আছেন। তাহলে গাছও সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। তেমনিভাবে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, ধূমকেতু, ছায়াপথ, মানুষ, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ একই সৃষ্টিকর্তার আলাদা আলাদা সৃষ্টি। সারকথা এ মহাবিশ্ব ও জীবকুলের একজন স্রষ্টা আছেন। স্রষ্টা সবকিছু সৃষ্টি করেন। আর মানুষ স্রষ্টার কোনো সৃষ্টির সাহায্য নিয়ে অন্য কিছু তৈরি করে। যেমন, স্রষ্টা গাছ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তা থেকে চেয়ার, টেবিল, নৌকা ইত্যাদি তৈরি করতে পেরেছে। তাই মানুষের তৈরি স্রষ্টার সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি তাঁর নিজের ইচ্ছাধীন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে এই স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। ঈশ্বরের অনেক নাম, অনেক পরিচয়। যেমন– ব্রহ্ম, ভগবান, পরমাত্মা ইত্যাদি। আবার পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে আত্মা বা জীবাত্মা বলে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষ,

মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের সবকিছুই হচ্ছে সৃষ্টি। এ সকল সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা তাঁর নাম ঈশ্বর। ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায় না। তাঁর কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির আকার আছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাঁকে অনুভব করি। তাঁকে তাঁর সৃষ্টির যে-কোনো আকৃতিতে অর্থাৎ সাকার রূপে উপলব্ধি করা যায়। সাধকেরা সাধনার মাধ্যমে এবং ভক্তেরা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করে থাকেন।

একক কাজ : স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে তোমার বাসস্থানের চারপাশের বিশটি সৃষ্টির তালিকা প্রস্তুত কর।

নতুন শব্দ : ব্রহ্ম, জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, নিরাকার, সান্নিধ্য, উপলব্ধি।

পাঠ ২ : স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। স্রষ্টা জীবকুলের কল্যাণে এ সুন্দর প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্র, নদী, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পালা, জীবজন্তু প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির অংশ। সৃষ্টার এই সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে গভীর সম্পর্ক। সূর্যের আলোয় পৃথিবী আলোকিত হয়। আলোর উপস্থিতিতে গাছ-পালা খাবার গ্রহণ করে। প্রাণীকূল এই আলোয় জীবনধারণের কাজে মেতে ওঠে। প্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্যের মূলেই রয়েছে এই সূর্যের আলো। এভাবে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সাথেই রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক। আর এ সবকিছুর সম্পর্ক সৃষ্টিকর্তাই নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রকৃতির সব উপাদানের মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মূলেই রয়েছেন তিনি। স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত সকল সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং ভালোবাসা ও সম্মান করা।

ঈশ্বর যে সৃষ্টি করেন তা তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়। তিনি নিজের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেন। একেই বলে তাঁর লীলা।

তিনি মহাবিশ্বের আকাশ, বাতাস, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-নদী, বনভূমি, গাছ-পালা ও বিচিত্রসব জীবজন্তু সৃষ্টি করে তাঁর লীলার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমরা সহজেই তা অনুভব করতে পারি। স্রষ্টা অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু সৃষ্টির আদি ও অন্ত আছে। অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্ভব ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু আছে।

দলগত কাজ : সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তোমাদের করণীয় সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ : বিদ্যমান, সেবিছে, পরিচর্যা, লীলা, প্রাণচাঞ্চল্য।

পাঠ ৩ : সকল জীবে স্রষ্টার অস্তিত্ব

সকল জীবের মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি সকল জীব সৃষ্টি করেছেন এবং জীবদেহেই অবস্থান করেন। তাই আমরা প্রতিটি জীবকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি। যেমন: আমরা তুলসীগাছকে পূজা করি আবার গাভীকেও মাতৃরূপে পূজা করি। স্রষ্টার এই সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করি। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন। তাই ঈশ্বরকে বাইরে খোঁজার প্রয়োজন হয় না এবং জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

ঈশ্বর সর্বত্রই রয়েছেন এবং তিনি জীবদেহে আত্মারূপে বিরাজ করেন। জীবদেহে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন বলেই জীবদেহ সচল। সুতরাং জীবদেহের সচলতা নির্ভর করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর। ঈশ্বর ছাড়া জীবদেহের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। আত্মাই জীবদেহের প্রাণ। জীবদেহ থেকে আত্মার সরে যাওয়াটাই হল জীবদেহের মৃত্যু। এ অবস্থায় জীবদেহের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে না। আত্মা নিরাকার। তাই আমরা আত্মাকে দেখতে পাই না কিন্তু তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে, আত্মার মৃত্যু হয় না, অবস্থান ত্যাগ করে অন্য অবস্থানে আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নেই।

আত্মাই ঈশ্বর। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। আত্মার এ পরিবর্তনের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবের জন্ম ও মৃত্যু। প্রতিটি জীবদেহে তাঁর উপস্থিতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টির উপর তাঁর কর্তৃত্বের কথা, সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের কথা। জীবের অস্তিত্ব স্রষ্টা বা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

একক কাজ : স্রষ্টার অস্তিত্বের কয়েকটি দৃষ্টান্ত চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : অস্তিত্ব, সচল, জীবদেহ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

পাঠ ৪: ঈশ্বরসম্পর্কিত সংস্কৃত মন্ত্র ও সরল অর্থ

ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম। তাঁর অসীম ক্ষমতা। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই কৃতজ্ঞতাবশত এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। একেই বলে স্তব বা স্তুতি। এসো, আমরা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকাশক একটি মন্ত্র পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করি :

নমস্তে পরমং ব্রহ্ম
সর্বশক্তিমতে নমঃ॥
নিরাকারোঽপি সাকারঃ
স্বেচ্ছারূপং নমো নমঃ। (যজুর্বেদ,শান্তি পাঠ)

সরল অর্থ: যিনি পরম ব্রহ্ম, যিনি সর্বশক্তিমান, নিরাকার হয়েও সাকার, ইচ্ছামত রূপধারী, তাঁকে নমস্কার করি।

এ মন্ত্র থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরের অপর নাম ব্রহ্ম। তাঁকে পরমব্রহ্মও বলা হয়। তিনি নিরাকার। তবে প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করে থাকেন। যেমন,

নিরাকার ঈশ্বর সাকার শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন অবতার রূপ ধারণ করেছেন। যেমন- বামন অবতার, নৃসিংহ অবতার, রাম অবতার ইত্যাদি। তিনি দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন করেন। এই অনন্ত শক্তিময় ঈশ্বরকে আমরা নমস্কার করি, বার বার নমস্কার করি।

একক কাজ : ঈশ্বর সম্পর্কিত মন্ত্রের শিক্ষা এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে লেখ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

নমস্তে – নমঃ+ তে। পরমং ব্রহ্ম – পরম ব্রহ্মকে। সর্বশক্তিমতে – সর্বশক্তিমানকে। নিরাকারঃ – নিঃ + আকারঃ। নিরাকারোঽপি – নিরাকারঃ + অপি (যার আকার নেই। যাকে দেখা যায় না, তবে অনুভব করা যায়। এখানে নিরাকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে)। সাকারঃ – স + আকারঃ (যার আকার আছে: প্রয়োজনে ঈশ্বর সাকারও হতে পারেন)।

স্বেচ্ছা – স্ব + ইচ্ছা। স্বেচ্ছারূপং – স্বেচ্ছারূপধারীকে অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরকে।

টীকা : বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্মগ্রন্থের কবিতাগুলোকে বলা হয় মন্ত্র এবং বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থের কবিতাগুলোকে বলা হয় শ্লোক।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. হিন্দুধর্ম মতে প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মারূপে .... বিরাজ করেন।

২. ভক্তেরা .... মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি করে।

৩. আত্মাই .... ।

৪. আত্মার .... নেই ।

৫. ঈশ্বরের প্রশংসামূলক মন্ত্রকে .... বলা হয়।

৬. প্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্যের মূলে রয়েছে ....।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বামপাশ	ডানপাশ
১. যারা সৎপথে চলে	অজ, নিত্য, শাশ্বত।
২. পরমাত্মা	জীবের জন্ম ও মৃত্যু।
৩. হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা	ঈশ্বর তাদেরকে ভালোবাসেন।
৪. আত্মার দেহ পরিবর্তনের মধ্যে লুকিয়ে আছে	রূপধারণ করতে পারেন।
৫. ঈশ্বর নিজের ইচ্ছেমতো	বিভিন্ন প্রকৃতিতে ঈশ্বরের পূজা করে।
	পরমেশ্বর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. **ঈশ্বরের অপর নাম কী?**

ক. ব্রহ্ম খ. বিষ্ণু

গ. শিব ঘ. ব্রহ্মা

২. **ঈশ্বর অবস্থান করেন -**

i. আকাশে

ii. জীবদেহে

iii. বাতাসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

প্রবীর বাবু এঁটেল মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি করেন এবং বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু তাঁর তৈরি পুতুল প্রকৃতির সৃষ্ট উপাদানের মতো নয়।

৩. **উপরের অনুচ্ছেদের বক্তব্যে যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো মানুষ-**

i. নিজের প্রয়োজনে অনেক কিছু তৈরি করতে পারে
ii. স্রষ্টার সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল
iii. স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. **প্রবীর বাবুর তৈরি পুতুল প্রকৃতির সৃষ্ট উপাদানের মতো নয়। কারণ তার তৈরি-**

i. উদ্দেশ্যগত কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টি স্রষ্টার ইচ্ছাধীন
ii. নির্দিষ্ট উপাদান দ্বারা কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টি নির্দিষ্ট উপাদান দ্বারা নয়
iii. বৈচিত্র্যপূর্ণ নয় কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল

সজীব প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অবস্থান উপলব্ধি করে। অন্যদিকে তার ভাই তুষার সারাক্ষণ বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। সুযোগ পেলেই সে কম্পিউটারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার ধারণা বিজ্ঞানই সর্বকিছু। সজীব ও তুষার দুই ভাই হওয়া সত্ত্বেও দুজনার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসের পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

ক. হিন্দুধর্ম অনুসারে সৃষ্টিকর্তাকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

খ. জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' অধ্যায়ের সারকথার সাথে তুষারের ধারণার মূল পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সজীবের উপলব্ধির মূলে রয়েছে 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস' - বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. নিরাকার ঈশ্বরকে কীভাবে উপলব্ধি করা যায় ?
২. আমরা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব কেন ? বুঝিয়ে লেখ।
৩. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক উদাহরণসহ তুলে ধর।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ঈশ্বরই পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা- যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর।
২. জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
৩. জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা'- উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ

যে গ্রন্থে অতি প্রাকৃতিক সত্তা (ভগবান, ঈশ্বর ইত্যাদি) ও কল্যাণকর জীবন যাপন সম্পর্কে আলোচনা, উপদেশ ও উপাখ্যান লেখা থাকে, তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীচণ্ডী, প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ। আমরা জানি, বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে বেদ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- ধর্মগ্রন্থের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সাধারণ পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনাচরণে বেদের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বাণী ব্যাখ্যা করতে পারব
- শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বেদ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ : ধর্মগ্রন্থের ধারণা

আমরা জানি, যে গ্রন্থে অতি প্রাকৃতিক সত্তার কথা থাকে, তাকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। ধর্মগ্রন্থে থাকে ঈশ্বরের বাণী ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। থাকে সৎ ও পরিশুদ্ধ জীবন-যাপনের বিধিবিধান। আমাদের মঙ্গল হয় এমন উপদেশ থাকে। এ সকল উপদেশ যে কেবল সরাসরি দেয়া হয় তা নয়। উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়। উপদেশের মাধ্যমে আমরা পাই নৈতিক শিক্ষা। এ নৈতিক শিক্ষা আমাদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। আমাদের অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন: বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি।

পাঠ ২ ও ৩ : বেদের সাধারণ পরিচয়

বেদ হিন্দুদের আদি এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান পবিত্র, বিচিত্র ও সুন্দর। এ জ্ঞান স্রষ্টা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান। জ্ঞানের কি শেষ আছে? জ্ঞান কি চেষ্টা ছাড়া পাওয়া যায়? তার জন্য চেষ্টা করতে হয়, সাধনা করতে হয়। গভীর চিন্তায় ডুবে যাওয়া বা নিমগ্ন হওয়াকে বলে ধ্যান। ধ্যানে সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। সত্য চিরন্তন, সনাতন। যা সনাতন তার অন্ত নেই। এ সত্য সৃষ্টি করা যায় না, এ সত্য গভীর ধ্যানের আলোকে দর্শন করা যায়– উপলব্ধি করা যায়।

প্রাচীনকালে যাঁরা সত্য বা জ্ঞান এবং স্রষ্টার মাহাত্ম্য দর্শন বা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো ঋষি। বেদ এই ঋষিদের ধ্যানলব্ধ পবিত্র জ্ঞান। ধ্যানের মাধ্যমে ঋষিগণ সেই সত্য দর্শন করে তাকে ভাবের আবেগে প্রকাশ করেছেন। এ জন্যই বলা হয়, বেদ সৃষ্ট নয়, দৃষ্ট। অর্থাৎ বেদ কেউ সৃষ্টি করেননি, উপলব্ধি করেছেন মাত্র।

একক কাজ : ধর্মগ্রন্থ ও সাধারণ গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত কর।

বেদে বহু দেব-দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন - অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বায়ু, বরুণ, রুদ্র, যম, উষা, বাক্, রাত্রি, সরস্বতী ইত্যাদি। তবে বেদে বলা হয়েছে, একই পরমাত্মা থেকে সকল দেব-দেবীর উদ্ভব। প্রত্যেকের গুণ ও শক্তি ভেদে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী রূপে প্রকাশিত।

ঋষিগণ এই দেব-দেবীর মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। তাঁদের স্তুতি বা প্রশংসা করেছেন এবং অসাধারণ শক্তি ও প্রভাবসম্পন্ন দেব-দেবীর কাছে ধন-সম্পদ, সুখ ও শান্তি প্রার্থনা করেছেন। ঋষিগণ বেদের দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন–

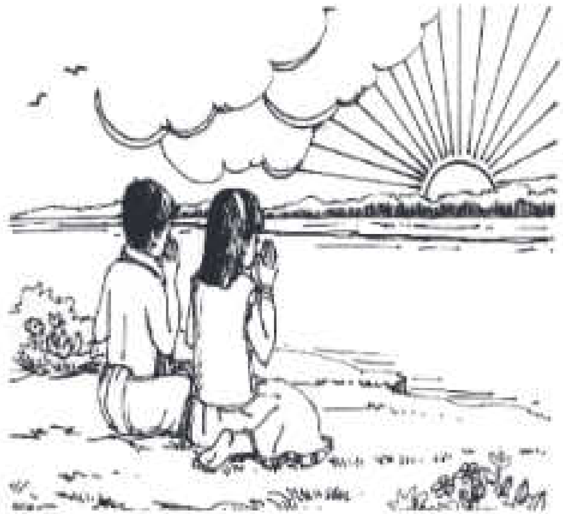

বৈদিক দেবতা

স্বর্গের দেবতা | **অন্তরীক্ষের দেবতা** | **মর্ত্যের দেবতা**

১. **স্বর্গের দেবতা :** এঁদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। এঁরা পৃথিবীতে নেমে আসেন না। যেমন– সূর্য, যম, বরুণ, প্রভৃতি।

২. **অন্তরীক্ষের দেবতা :** এঁদের উনাদের ক্ষমতা বোঝা যায়, দেখাও যায়। তাঁরা মর্ত্যে নেমে আসেন কিন্তু অবস্থান করেন না। যেমন– ইন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি।

৩. **মর্ত্যের দেবতা :** যে সকল দেবতা মর্ত্যে বা পৃথিবীতে আসেন এবং অবস্থান করেন তাঁদের বলা হয় মর্ত্যের দেবতা। যেমন- অগ্নি দেবতা।

অগ্নিকে আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই। তাই তাঁর কাছে ভালো ভালো জিনিস উৎসর্গ করে তাঁরই মাধ্যমে অন্যান্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। এভাবে আগুন জ্বেলে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহ্বান জানানো এবং এই প্রার্থনা করাকে যজ্ঞ বলা হয়।

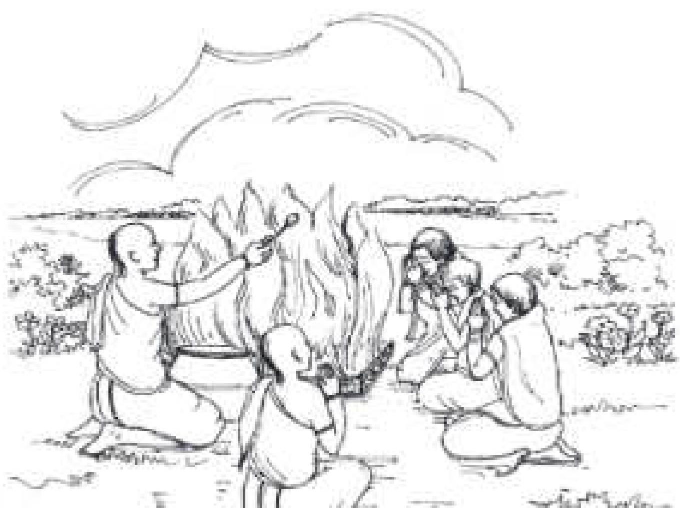

বেদের ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে বলা হয় মন্ত্র। ঋষিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে ধর্মানুষ্ঠান বা উপাসনা করেছেন। বৈদিক উপাসনা পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোম করা। এছাড়া বেদের বাক্য সুর দিয়ে যজ্ঞের সময় গান করা হয়। বেদে রয়েছে এই রকম কিছু গান। এই গানকে বলা হতো সাম। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিচিত্র জ্ঞানের কথাও বেদে রয়েছে।

দলীয় কাজ : স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরিক্ষের দেব-দেবীর একটি তালিকা তৈরি কর।

বেদের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়বস্তু ও রচনা রীতির পার্থক্য সামনে রেখে বেদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বেদকে তিনি বিভক্ত করেছেন বলে তাঁকে বলা হয়েছে বেদব্যাস। বেদকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।

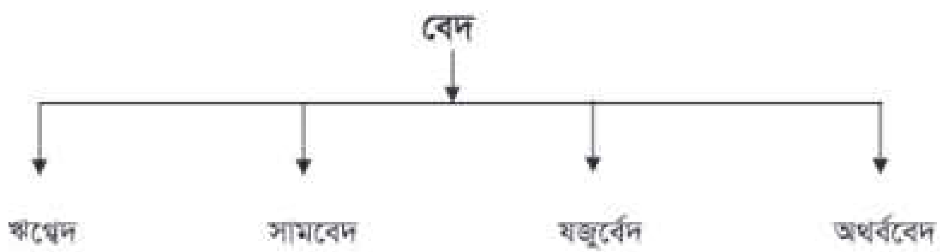

১. **ঋগ্বেদ** – ঋক্ মানে মন্ত্র। ঋগ্বেদে রয়েছে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। স্তুতি মানে প্রশংসা আর প্রার্থনা মানে কোনো কিছু চাওয়া। প্রার্থনা করে এক এক দেবতার কাছ থেকে এক এক বিষয় চাওয়া হয়। এখানে ১০৪৭২টি মন্ত্র রয়েছে। এগুলো পদ্যে বা ছন্দে রচিত যা এক ধরনের কবিতা। ঋগ্বেদ অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্রের সংগ্রহ।

২. **সামবেদ** – সাম মানে গান। এই বেদে সংগৃহীত হয়েছে গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক বা মন্ত্র আবৃত্তি না করে সুর করে গাওয়া হতো। যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই গান গাওয়া হয়। সামবেদে সর্বমোট ১৮১০টি মন্ত্র আছে।

৩. **যজুর্বেদ** – যজুঃ মানে যজ্ঞ। যজুর্বেদে রয়েছে এমন কিছু মন্ত্র যেগুলো যজ্ঞ করার সময় উচ্চারিত হয়। এখানে যজ্ঞের নিয়ম পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে। এটি কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ নামে দুভাগে বিভক্ত। দুটিতে মোট ৪০৯৯টি মন্ত্র রয়েছে।

৪. **অথর্ববেদ** – চিকিৎসা বিজ্ঞান, বাস্তুকলা, ইত্যাদি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের জ্ঞান নিয়ে সংকলিত হয়েছে অথর্ববেদ। এখানে প্রায় ৬০০০টি মন্ত্র রয়েছে।

এই যে বেদের চারটি ভাগ, এর একেকটি ভাগকে সংহিতা বলা হয়েছে। যেমন- ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা এবং অথর্ববেদ সংহিতা।

একক কাজ : ছকে প্রদত্ত বেদ-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কমপক্ষে দুটি বাক্য লিখে ছক পূরণ কর।	ঋগ্বেদ	সামবেদ	যজুর্বেদ	অথর্ববেদ

নতুন শব্দ : নিমগ্ন, উপলব্ধি, সনাতন, ধ্যানলব্ধ, দৃষ্ট, মাহাত্ম্য, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য, স্তুতি, ঋক্, সাম, যজুঃ, সংহিতা, বাস্তুকলা।

পাঠ ৪ : বেদের শিক্ষা ও গুরুত্ব

বেদ পাঠ করলে স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। প্রত্যেকটি বেদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর সম্পর্কে জানতে পারি এবং এর মাধ্যমে দেব-দেবীর স্তুতি বা প্রশংসা করতে শিখি। অগ্নি, ইন্দ্র, উষা, রাত্রি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের কর্মচাঞ্চল্যকে আদর্শ করে, আমরা আমাদের জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করব। যজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ হচ্ছে যজুর্বেদ। এ থেকে জানতে পারি সেকালে উপাসনা পদ্ধতি কেমন ছিল। যজুর্বেদ অনুসরণে বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা জন্মে। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করা হতো। যজ্ঞের বেদি নির্মাণের কৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে। সামবেদ থেকে সেকালের গান ও রীতি সম্পর্কে জানতে পারি।

অথর্ববেদ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল। এখানে নানা প্রকার রোগব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায় স্বরূপ নানা প্রকার লতা, গুল্ম বৃক্ষাদির বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ নামে চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি উৎস এই অথর্ববেদসংহিতা। বলা যায়, অথর্ববেদ থেকে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং সমগ্র বেদ পাঠে পরমাত্মা, বৈদিক দেব-দেবী, যজ্ঞ, সঙ্গীত, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও পরিপাটি করে তোলা যায়। আর এজন্যই এ গ্রন্থ আমাদের প্রত্যেকের পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

দলীয় কাজ : ছক পূরণ

বেদ-এর শ্রেণি বিভাগ	শিক্ষা
ঋগ্বেদ	
সামবেদ	
যজুর্বেদ	
অথর্ববেদ	

নতুন শব্দ : কর্মচাঞ্চল্য, বর্ষপঞ্জি, স্বরূপ, তুল্য ।

পাঠ ৫ : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পরিচয়

মহাভারত আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ । এ গ্রন্থটি আঠারোটি পর্ব নিয়ে সৃষ্টি । ভীষ্মপর্ব মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব । এই পর্বে মোট আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে । মহাভারতের ভীষ্মপর্বের এই অধ্যায়সমূহ ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত বিন্যস্ত, যাতে হস্তিনাপুর রাজ্যে সংঘটিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে । আমরা অনেকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনি ছোটদের মহাভারত পড়ে কিংবা টিভি চ্যানেলে প্রচারিত ধারাবাহিক নাটক থেকে জেনেছি । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন, তারই গ্রন্থরূপ হলো শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা । এই গ্রন্থে সর্বমোট সাতশত শ্লোক রয়েছে । এ জন্য এ গ্রন্থের অপর নাম সপ্তশতী । এবার আমরা হস্তিনাপুরের কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত যুদ্ধের কাহিনি থেকে আমাদের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণালাভ করব ।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই । ধৃতরাষ্ট্র বড়, পাণ্ডু ছোট । ধৃতরাষ্ট্রের একশ ছেলে আর এক মেয়ে । যেমন– দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি ও মেয়ে দুঃশলা । পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে- যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব । কুরুবংশের নাম অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের বলা হয় কৌরব । আর পাণ্ডুর নাম অনুসারে তার সন্তানদের বলা হয় পাণ্ডব । রাজ্য নিয়ে এই কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অবতাররূপে দ্বারকার রাজা ছিলেন । তিনি নিরস্ত্র অবস্থায় অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন । রথ যখন দুইপক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখা হলো তখন অর্জুন

স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দেখে মুষড়ে পড়লেন। অতি নিকট আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করবেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দেন।

সেই উপদেশ বাণীই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উপদেশ শুনে অর্জুন যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হন। উপলক্ষ অর্জুন হলেও গীতায় ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, তা সকল কালের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

একক কাজ : পাণ্ডব ও কৌরবদের বংশধর চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : সপ্তশতী, সারথি, উদ্বুদ্ধ, কুরু।

পাঠ ৬ : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী

গীতায় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এবং ফলের আশা না করে নিজের কাজ করতে বলা হয়েছে। কাজটাই বড়, ফল যা-ই হোক। কর্মফলের কথা চিন্তা করতে থাকলে কাজের প্রতি একাগ্রতা আসে না। এভাবে ফলের আশা না করে কাজ করাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।। গীতা-২/৪৭

অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নেই। কর্মফলের প্রতি তুমি আসক্ত হয়ে যেন নিজ কর্তব্যের প্রতি অবহেলা না করো।

অর্জুন যে আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে চাইছেন না, এতে কোন লাভ হচ্ছে না। এর কারণ আমাদের জন্ম এবং মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে। সুতরাং কারো মৃত্যু অর্জুনের যুদ্ধ করা বা না করার ওপর নির্ভর করে না। অর্জুন নিজেই কি জানেন কখন তাঁর মৃত্যু ঘটবে! তাছাড়া ঈশ্বরই আত্মারূপে আমাদের মধ্যে থাকেন। তাই মৃত্যুর মাধ্যমে দেহের ধ্বংস হলেও, আত্মার ধ্বংস হয় না। আত্মাকে অগ্নি, বায়ু, জল– কেউ ধ্বংস করতে পারে না।

এক্ষেত্রে বলা হয়েছে–

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
>
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
>
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
>
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। *গীতা- ২/২০*

অর্থাৎ আত্মার কখনও জন্ম বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।

শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনো বিনষ্ট হয় না। আত্মা সনাতন, অবিনশ্বর। শুধু স্থানান্তর হয়। আত্মাকে এভাবে জানতে পারলে আর দুঃখ থাকে না। তখন সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় সমান হয়ে যায়। গীতায় যোগের কথা বলা হয়েছে। যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল বা উপায়। নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য আরাধনা করেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভক্ত বলেছেন। ভক্ত চার রকম যথা- আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। যিনি বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে ডাকেন তিনি আর্তভক্ত। যিনি কোন ইচ্ছা বা প্রার্থনা পূরণের জন্য ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁকে অর্থার্থী ভক্ত বলা হয়। যিনি জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে চান তিনি হচ্ছেন জিজ্ঞাসু ভক্ত। আর যিনি কোন কিছু পেতে না চেয়ে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং এজন্য তাকে ডাকেন, তাকে জ্ঞানীভক্ত বলা হয়। গীতা সব উপনিষদের সারকথা। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কে ধারণা এক জায়গায় সমন্বিতরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। গীতামাহাত্ম্যে তাই বলা হয়েছে উপনিষদ যেন গাভী স্বরূপ, আর দুগ্ধ হচ্ছে গীতা। গোবৎস যেমন একটু একটু আঘাত করে দুধ বের করে, অর্জুন তেমনি গোবৎসের মতো প্রশ্ন করে একটু একটু আঘাত করেছেন। আর গীতারূপ দুধ দোহন করেছেন অর্থাৎ গীতারূপ জ্ঞানের কথা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শ্রবণ করেছেন।

একক কাজ : গীতার উপদেশসমূহ চিহ্নিত কর এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য তুমি যে ধরনের কাজ করতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দলগত কাজ : ছকে উল্লিখিত ভক্ত সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখে ঘরগুলো যথার্থভাবে পূরণ কর	আর্তভক্ত	অর্থার্থীভক্ত	জিজ্ঞাসুভক্ত	জ্ঞানীভক্ত

নতুন শব্দ : আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, সান্নিধ্য।

পাঠ ৭ : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার গুরুত্ব

গীতা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয় । কারণ স্বয়ং ভগবানই যুগে যুগে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতার রূপে নেমে আসেন ।

তিনি বলেছেন–

> যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহম্ ॥
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।। *গীতা- ৪/৭-৮*

অর্থাৎ যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান, তখনই সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টলোকদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই ।

আত্মার ধ্বংস নেই । -গীতার এই শিক্ষা আমাদের মৃত্যুকে ভয় না করে ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায় ।

গীতায় বলা হয়েছে- ১. শ্রদ্ধাবান ও সংযমীই জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় ২. অনাসক্ত কর্মযোগী মোক্ষ লাভ করেন ৩. জ্ঞানীভক্তই তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করেন এবং ৪. এই বিশাল বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান ।

গীতার এই কথা থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও সংযম সাধনার দিকে মনোনিবেশ করি । জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্মোহ হওয়ার প্রেরণা পাই । ধর্ম অনুশীলনের কাজে বিচারে প্রবৃত্ত হই অর্থাৎ অর্থহীন গতানুগতিক পথ পরিহার করে তত্ত্বের মর্মার্থ বোঝবার চেষ্টা করি । সবকিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত ভেদবুদ্ধি দূর করে দিয়ে অন্যকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি । যে যেভাবে বা যে পথে ঈশ্বরকে ডাকতে চায় ডাকুক । ঈশ্বর সে ভাবেই তার ডাকে সাড়া দেন । এখানেই বেজে ওঠে ধর্মসমন্বয়ের সুর ।

গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে । একই সাথে বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হবে সেই পথও দেখানো হয়েছে । এসব দিক থেকে হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গীতার গুরুত্ব অপরিসীম ।

একক কাজ : ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শিক্ষার প্রভাব লেখ ।

নতুন শব্দ : সংযমী, মোক্ষ, নির্মোহ, ভেদবুদ্ধি, প্রবৃত্ত ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

১. বেদ শব্দের অর্থ .... ।

২. বেদে বর্ণিত দেব-দেবীদের .... ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

৩. সমগ্র বেদকে .... ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

৪. গীতার অপর নাম .... ।

৫. ন হন্যতে .... শরীরে।

৬. চতুর্বেদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় .... ।

২। ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল করঃ

বামপাশ	ডানপাশ
ক. সত্য সৃষ্টি করা যায় না	ভেষজ ঔষধের বর্ণনা আছে
খ. স্বর্গের দেব-দেবীরা	যজ্ঞের নিয়ম পদ্ধতি আছে
গ. যজুর্বেদ	পৃথিবীতে নেমে আসেন না
ঘ. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা	উপলব্ধি করা যায়
ঙ. আয়ুর্বেদে	অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়
	সংগীত সম্পর্কে ধারণা আছে

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১. স্বর্গের দেবতা কে?

ক. অগ্নি খ. ইন্দ্র

গ. সূর্য ঘ. বায়ু

২. সমগ্র বেদে মোট কতটি মন্ত্র আছে?

ক. ১০৪৭২ খ. ১৮১০

গ. ৪০৯৯ ঘ. ২২৩৮১

৩. আমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জানতে পারব

i. ঈশ্বরের বাণী ও মাহাত্ম্য

ii. মঙ্গলজনক উপদেশ

iii. জীবন যাপনের বিধি-বিধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

অয়ন প্রতিদিন সকালে ভীষ্মপর্বের কর্মযোগ অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে। সে অনুভব করে কর্মফলে তার কোনো অধিকার নেই। ফলে কোনো কিছু প্রত্যাশা না করে সে তার নিত্যকর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করে।

৪. অয়ন কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে?

ক. রামায়ণ খ. শ্রীচণ্ডী

গ. বেদ ঘ. শ্রীমদভগবদ্গীতা

৫. অয়নের অনুভূতির মর্মকথা হচ্ছে-

১০১৫

ক. সকামকর্ম খ. নিষ্কাম কর্ম

গ. যজ্ঞ কর্ম ঘ. নিত্যকর্ম

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ধর্মগ্রন্থ বলতে কী বোঝায়?

২. শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন কেন?

৩. গীতা অনুসারে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর ।

৪. অথর্ববেদের ধারণা ব্যাখ্যা কর ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্'- কথাটি ব্যাখ্যা কর ।

২. বৈদিক দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর ।

৩. বেদের সংহিতাগুলো বর্ণনা কর ।

৪. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উদ্ভব কাহিনি বর্ণনা কর ।

৫. 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।

৬ । সৃজনশীল প্রশ্ন:

রমেশ বাবু নিয়মিত বেদ অধ্যয়ন করেন । এই বেদের জ্ঞানের আলোকে তিনি বনের গাছপালা ও লতাপাতা থেকে ঔষধ তৈরি করে জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন । শুধু তাই নয়, রোগীদের সাথে তিনি ধর্মালাপও করেন । এজন্য বেদের অন্যান্য খণ্ডও তাকে অধ্যয়ন করতে হয় । অবশ্য এর আলোকে তিনি নিজেও চেষ্টা করেন পরিশুদ্ধ জীবনযাপনের ।

ক. ধ্যান কাকে বলে?

খ. প্রাচীনকালের ঋষিদের বেদের দ্রষ্টা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর ।

গ. রমেশ বাবু বেদের কোন ভাগের জ্ঞানের আলোকে জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. রমেশ বাবুর অধ্যয়নকৃত গ্রন্থের জ্ঞানের আলোকে কি পরিশুদ্ধ জীবন যাপন সম্ভব? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর ।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

হিন্দুধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম । এ ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম । দেব-দেবীর পূজা অর্চনা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক । এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান । তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য মানুষের ধর্মাচরণ করতে হয়। মানুষ ভক্তিভরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলে ভগবান তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন । বাস্তব জীবনে মা-বাবা সন্তানের লালন পালন ও সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করে থাকেন । সন্তানের উচিত দেবতা জ্ঞানে মা-বাবার সেবা-শুশ্রূষা করা । একই সাথে সমাজের অন্যান্য গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা । এ অধ্যায়ে সনাতন ও হিন্দুধর্মের সম্পর্ক, হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস এবং ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে গুরুজনে ভক্তি, মাতৃভক্তি, কর্তব্যবোধ ইত্যাদি দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যানসহ আলোচিত হয়েছে ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- সনাতনধর্ম ও হিন্দুধর্ম - এ ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করব
- ধর্মবিশ্বাস ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- গুরুজনে ভক্তি ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- কীভাবে গুরুজনকে ভক্তি করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারব
- মাতৃভক্তির একটি গল্প বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মের আলোকে কর্তব্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাতা-পিতার প্রতি সন্তানদের কর্তব্য এবং সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- গুরুজনে ভক্তি ও কর্তব্য পালনে সচেতন হব ।

প্রথম পরিচ্ছেদ :
হিন্দুধর্মের স্বরূপ

পাঠ ১ : সনাতন ও হিন্দুধর্মের ধারণা

সনাতন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম মূলত একই ধর্ম। অন্য কথায়, সনাতন ধর্মের অপর নাম হিন্দুধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন। যা অতীতে ছিল বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে, সেটি সনাতন। সনাতন শব্দটিতে চিরদিনের কথা নির্দেশ করা হয়। সময়ের পরিবর্তনেও যার কোন পরিবর্তন হয় না সেটিই সনাতন। 'হিন্দু' শব্দটি এসেছে সিন্ধু শব্দ থেকে। সিন্ধুনদ প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত। এই নদের তীরে প্রাচীনকালে সনাতন ধর্মের লোক বাস করত। তাদের আচার-আচরণ, ধর্ম বিশ্বাসে একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল।

বিদেশিদের কাছে এদের পরিচয় হয় সিন্ধু নদের নামে। বিদেশিরাই সিন্ধু শব্দকে হিন্দু বলে উচ্চারণ করত। আর সেখানকার সনাতন ধর্মের লোকদেরকে তারা বলত হিন্দু। হিন্দুদের সনাতন ধর্মই তাদের ভাষায় হয়ে ওঠে 'হিন্দুধর্ম'।

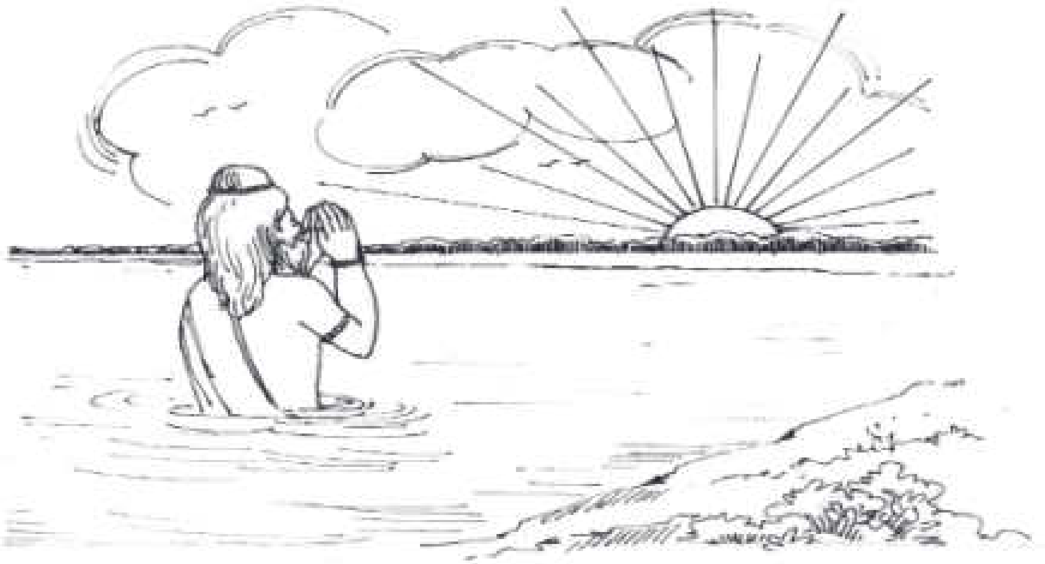

এই ধর্ম অতি প্রাচীন। সময়ের অগ্রগতিতেও এ ধর্মের মূল ধারণাগুলোর কোন পরিবর্তন নেই। তবে দেশ-কালের প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে এ ধর্মে নতুন চিন্তা-চেতনা সংযুক্ত হয়েছে। হিন্দুধর্ম নামে নতুন নামকরণ হয়েছে। এভাবেই সনাতন ধর্মের বিকাশ ঘটেছে এবং ঘটছে।

মোটকথা, সনাতন ধর্মের নতুন পরিচয় হচ্ছে হিন্দুধর্ম নামে। সনাতন ধর্মে যে চিন্তা-চেতনা সেটিই হিন্দুধর্মের চিন্তা- চেতনা। হিন্দুধর্মের মূল ধর্মবোধ হচ্ছে- ঈশ্বরে বিশ্বাস, কর্মফলে বিশ্বাস, জন্মান্তরে বিশ্বাস, ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা, দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ, জগতের কল্যাণ সাধন ইত্যাদি।

নতুন শব্দ : চিরন্তন, কর্মফল, সনাতন, জন্মান্তর।

পাঠ ২ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস

হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস সনাতন ধর্মের পরিচিতির মধ্যেই বর্তমান। সনাতন ধর্ম কোন একজন মাত্র মুনি, ঋষি বা অবতারপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম নয়। আদিম মানুষের মনে যখন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়বোধ জেগেছিল– এক কথায়, ধর্মবোধ জেগেছিল, সেখান থেকে এ ধর্মের বিকাশ শুরু। আর সমাজের চিন্তাশীল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণার ফসল নিয়ে এ ধর্ম ক্রমশ বিকাশ লাভ করে।

হিন্দু ধর্মের মূলে রয়েছেন স্বয়ং ভগবান। ভগবান বা স্রষ্টা জগৎসৃষ্টির সাথে সাথে ধর্মেরও সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জীবন সুন্দর ও সুখময় করার জন্যই ধর্ম এসেছে। হিন্দু ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে স্রষ্টা বা ভগবান আছেন। তাঁর সৃষ্ট জগতে মানুষকে কাজ করতে হচ্ছে। আর প্রতিটি কাজের যে ফল সেটিও মানুষকে ভোগ করতে হয়। একেই বলে কর্মফল– যা জন্মান্তরেও ভোগ করতে হয়। এর ফলে আসে জন্মান্তরের কথা। অমঙ্গল ও দুষ্টজনের অত্যাচার থেকে জগতকে মুক্ত করার জন্য ভগবান অবতাররূপে আবির্ভূত হন। ঈশ্বরের উপাসনা, নামজপ, কীর্তন এবং দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি ধর্মকর্মের অনুশীলন করে মানুষ সুখ শান্তি এবং মুক্তি লাভ করতে পারে।

সনাতন ধর্ম চিন্তায় যেমন ছিল পুনর্জন্ম, অবতার ও মোক্ষলাভের কথা- এ সবই রয়েছে হিন্দুধর্মে। তবে ধর্ম আচরণের পদ্ধতি হিসেবে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে সনাতন বা হিন্দু ধর্মে ধর্মানুষ্ঠান ছিল যজ্ঞক্রিয়া। সেটি ক্রমে দেব-দেবীর আরাধনায় রূপ নিয়েছে। যজ্ঞকর্মে দেব-দেবীর শক্তি ও রূপের বর্ণনা নিয়ে যজ্ঞক্রিয়া হতো। পরবর্তীকালে ঐ দেব-দেবীরই রূপ কল্পনা করে বিগ্রহ বা প্রতিমার মাধ্যমে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা হয়। সনাতন ধর্মের যে অবতার ও মোক্ষলাভের বিষয় রয়েছে এ সবই হিন্দুধর্মের সম্পদ। তবে ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে হিন্দুধর্মে আচার- আচরণে কিছু কিছু নতুনত্বও এসেছে। বৈদিক যুগের যজ্ঞক্রিয়া পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আধুনিক হিন্দুধর্মে শুধু ঈশ্বরের নাম ও গুণকীর্তনের প্রচলন হয়েছে।

সনাতন ধর্মচর্চার আচার-আচরণ, পোশাক- পরিচ্ছদের একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল। এদেশের বাইরে থেকে ইরান, গ্রিস প্রভৃতি দেশের জনগোষ্ঠী এখানে আসে। তারা সিন্ধুনদের তীরবর্তী লোকদেরকে একটি ভিন্ন মানবগোষ্ঠী মনে করত। বিদেশিদের উচ্চারণে সিন্ধু শব্দটির 'স' এর স্থলে 'হ' হয়ে উচ্চারিত হয়। ফলে সিন্ধু শব্দটি হয়ে পড়ে হিন্দু শব্দ। আর সিন্ধুনদের তীরবর্তী লোকজনও ঐ বিদেশিদের ডাকে হিন্দু হয়ে যায়। আর এটি আস্তে আস্তে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে এদেশে সনাতন ধর্মের অনুসারী মাত্রই হিন্দু নামে পরিচিত হয়।

হিন্দুধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈশ্বরকে বিশ্বাস, ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা এবং একই সঙ্গে জগতের কল্যাণ সাধন। এখানে রয়েছে ঈশ্বর আরাধনার বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ। আর এ সুযোগের মধ্য দিয়ে মানুষ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সহজ সরল রূপ পেয়ে যায়। এভাবে এ ধর্মের অনুসারীরা মুক্তচিন্তার অধিকার পেয়ে গর্ববোধ করেন।

একক কাজ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তির বিকাশ ধারাবাহিকভাবে লেখ।

নতুন শব্দ : সনাতন, অবতার, সিন্ধুনদ, যজ্ঞক্রিয়া, মোক্ষলাভ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. সিন্ধুনদ .... থেকে প্রবাহিত ।

২. কর্মফল ....ভোগ করতে হয় ।

৩. সনাতন ধর্মের অনুসারী মাত্রই .... নামে পরিচিত হয় ।

৪. হিন্দুধর্ম .... নতুন ধর্ম নয় ।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বামপাশ	ডানপাশ
ক. হিন্দু শব্দটি এসেছে	করার জন্যই ধর্ম এসেছে
খ. বিদেশিরা সিন্ধু শব্দকে হিন্দু বলে	যজ্ঞ ক্রিয়া
গ. মানুষের জীবন সুন্দর, সুখময়	গাছপালা
ঘ. প্রাচীনকালে ধর্মানুষ্ঠান ছিল	সিন্ধু শব্দ থেকে
ঙ. আধুনিক হিন্দুধর্মে শুধু ঈশ্বরের নাম ও	প্রচলন হয়েছে
গুণকীর্তনের	উচ্চারণ করত

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সনাতন শব্দের অর্থ কি ?

ক. চিরকাল খ. আজীবন

গ. চিরন্তন ঘ. পুরাতন

২. সনাতনধর্মের মূলে কে রয়েছেন?

ক. ব্রহ্মা খ. ভগবান

গ. বিষ্ণু ঘ. শিব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনুপমা দেবী ঘরে নিয়মিত পূজা অর্চনা করার পাশাপাশি তিথি অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনাও করেন।

৩. অনুপমা দেবীর আচরণে কোন্ বিশ্বাসটি বেশি সক্রিয়?

ক. পূজা খ. কর্ম

গ. ধর্ম ঘ. যোগ

৪. অনুপমা দেবী ইহকাল ও পরকালে লাভ করতে পারেন-

i. সুখ

ii. শান্তি

iii. মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. সনাতন শব্দটি দ্বারা কী বোঝায় ?

খ. কীভাবে 'হিন্দু' শব্দটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ?

গ. ভগবান অবতাররূপে এসে কী করেন ?

ঘ. মানুষ ধর্মকর্মের অনুশীলন করে কেন ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

ক. সনাতন ও হিন্দু ধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

খ. হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা কর।

গ. যজ্ঞ করার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানুষের জন্মান্তর হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

কবিতা তার মায়ের সাথে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখল, ব্রাহ্মণ আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে দেবতাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। ঠিক একই অবস্থা সে দেখতে পেল দুর্গাপূজার সময় এবং মাকে সে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তার মা প্রশ্নের উত্তরগুলো তাকে বুঝিয়ে বলেন।

ক. প্রাচীনকালে সনাতন ধর্মের লোক কোন নদের তীরে বাস করত?

খ. সনাতন ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ব্রাহ্মণ কোন কাজের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বান করেছেন? হিন্দুধর্মের উৎপত্তির আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'প্রতিমাপূজার উৎপত্তির সাথে ব্রাহ্মণের উক্ত কাজটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।' উত্তরের স্বপক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হিন্দুধর্মের বিশ্বাস

পাঠ ১ : ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তি

হিন্দুধর্ম কতিপয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত । এ বিশ্বাসগুলোকে এক কথায় বলা হয় ধর্মবিশ্বাস । ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ কল্যাণ লাভ করে । ধর্ম শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে ধরে রাখার ক্ষমতা । ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে চলার নির্দেশ দেয় । ধর্ম আচরণের রীতি-নীতি মানুষকে সুন্দর জীবন পথে চলতে সাহায্য করে । জীবনের কল্যাণ চিন্তা, ভালোভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ লাভ করা যায় ধর্ম থেকে । ধর্মের বিধি-বিধান মেনেই মানুষ ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল লাভ করতে পারে ।

ধর্ম হচ্ছে ধারণশক্তি । সকল কল্যাণকামী গুণ বা গুণাবলী ধারণ করলে মানুষের জীবন বিকশিত হয় ও সার্থক হয় । ধর্মের এই গুণাবলি এবং এ গুলোর প্রতি যে বিশ্বাস, তাকেই এক কথায় ধর্মবিশ্বাস বলা যায় ।

পাঠ : ২ ও ৩ : গুরুজনে ভক্তি এবং ভক্তির উপায়

গুরুজনে ভক্তি

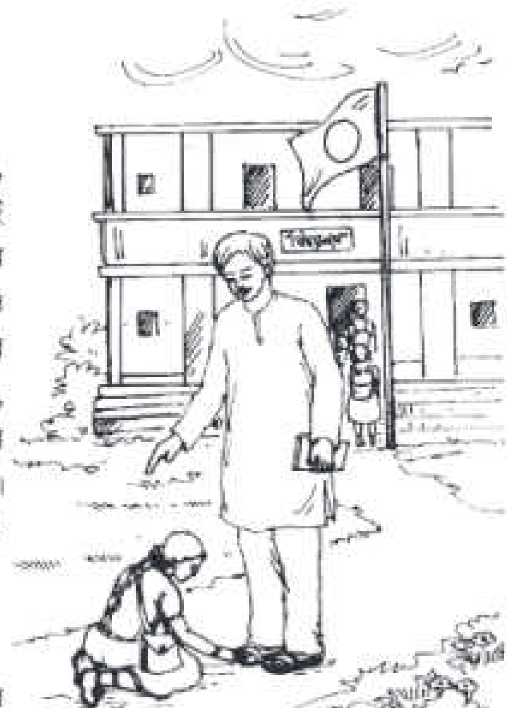

বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাদের গুরুজন । মা-বাবা, পিতামহ, মাতামহ, কাকা-কাকি, মামা-মামি, বড়ভাই ও বোনসহ অনেকেই আমাদের পরিবারের গুরুজন । পরিবারে আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমেও অনেক গুরুজন রয়েছেন । আবার শিক্ষকগণও আমাদের গুরুজন । যিনি দীক্ষাদান করেন তিনিও আমাদের গুরুজন । তাহলে আমাদের জীবন গঠনে মাতা, পিতা, শিক্ষকসহ বিভিন্ন গুরুজনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । এসকল গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভরে ভালোবাসা প্রদর্শনের নামই ভক্তি । ভক্তিতে থাকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং পুণ্য । ভক্তির মাধ্যমেই আমরা লাভ করি পুণ্য এবং মুক্তি ।

গুরুজনে ভক্তির উপায়

মাতা ও পিতা আমাদের পরম গুরু । মা-বাবার স্থান আমাদের জীবনে সবার উপরে । এই পৃথিবীর আলো যিনি দেখিয়েছেন তিনি আমাদের মা । মায়ের সাথে রয়েছে আমাদের নাড়ির বন্ধন । মা আমাদের সুখের সাথি আবার দুঃখেরও ভাগীদার । আমাদের সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম । শিশুকাল হতে মা পরমযত্নে আমাদের বড় করে তোলেন । বড় হলেও মায়ের নিকট আমরা সর্বদাই শিশু । আমরা অনেকেই মাতৃপূজা করি । কোনো মঙ্গলযাত্রায় আমরা সর্বাগ্রে মাকে প্রণাম করি । আমাদের ধর্মে মায়ের স্থান সবার উপরে । মা সন্তানের ভক্তিতে সন্তুষ্ট থাকলে দেবতারাও তুষ্ট হন । তাই আমরা মায়ের কাজে সাহায্য করব । মায়ের

আদেশ, নির্দেশ কর্তব্যজ্ঞানে মেনে চলব। কোনো কারণে মায়ের অন্তর কষ্ট পেলে মায়ের প্রতি ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। পিতাও মায়ের মতো আমাদের আদর্শ জীবন গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকেন। পিতা সম্পর্কে আমাদের ধর্মে শ্লোক রয়েছে। যেমন-

> পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
> পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

অর্থাৎ পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীত হলে সকল দেবতাই তুষ্ট হন।

শিক্ষকগণ আমাদের শিক্ষাগুরু। শিক্ষক আমাদের জীবন চলার পথ প্রদর্শক। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আলো শিক্ষকগণই জ্বালিয়ে রাখেন। তাদের আদেশ, নিষেধ মান্য করা আমাদের কর্তব্য। আবার দীক্ষাগুরু ও আমাদের গুরুজন। আমাদের জীবন চলার পথে ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা তারা দিয়ে থাকেন। এভাবে আমাদের জীবন চলার পথে সকল গুরুজনের প্রভাব রয়েছে। তাই আমরা সকল গুরুজনকেই মনে প্রাণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি।

একক কাজ : তোমার গুরুজন কারা এবং তাদেরকে তুমি কীভাবে ভক্তি কর?

এ প্রসঙ্গে মাতৃভক্ত গণেশ ও কার্তিকের গল্পটি স্মরণ করা যায়।

পাঠ ৪ : গণেশের মাতৃভক্তি

মা দুর্গার ছেলে গণেশ ও কার্তিক। গণেশের দেহটি মোটাসোটা; ইঁদুর তাঁর বাহন। অপরদিকে কার্তিকের সুঠাম বলিষ্ঠ

দেহ; তাঁর বাহন ময়ূর। মা দুর্গা ঘোষণা করলেন, যে আগে পৃথিবী ঘুরে এসে মাকে প্রণাম করতে পারবে তাকেই তিনি গলার হার দেবেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। গণেশ দেখলেন তাঁর বাহন ইঁদুরকে নিয়ে কার্তিকের বাহন ময়ূরকে হারানো সম্ভব নয়। তখন গণেশের মনে হলো, মাতা জগৎরূপিণী; তিনিই পৃথিবী। তাঁর চারিদিকে ঘুরে আসলেই পৃথিবী ঘোরা হয়ে যাবে। এই চিন্তা করে গণেশ ভক্তিভরে মায়ের চারিধার ঘুরে এসে মাকে প্রণাম করলেন। অপরদিকে কার্তিক দ্রুত গতিতে পৃথিবী ঘুরে এসে দেখেন গণেশের গলায় মা হারটি পরিয়ে দিয়ে গণেশকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এ ঘটনার কারণ জানতে চাইলে মা দুর্গা কার্তিককে বললেন, গণেশ অত্যন্ত

জ্ঞানী। সে জানে মাতাই পৃথিবী। তাই তাঁর চারপাশে ঘুরলে পৃথিবী ঘোরা হয়। গণেশের এ মাতৃভক্তি জগতে অমর হয়ে রয়েছে। সকল ছেলে-মেয়েরই উচিত মাতা-পিতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করা, সেবা করা।

নতুন শব্দ : ধর্মবিশ্বাস, কর্তব্য, বাহন, প্রতিযোগিতা, জগৎরূপিণী, মাতৃভক্তি।

পাঠ-৫ : কর্তব্যবোধের ধারণা

যা কিছু করা হয় তাই কর্ম। আর যে সকল কর্ম অনুশীলন করা আবশ্যক তাই কর্তব্য। অর্থাৎ যা করা উচিত তাই আমাদের কর্তব্য। কর্তব্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ এবং মমত্ব জাগ্রত হওয়াকে বলে কর্তব্যবোধ। মাতা-পিতার আদেশ পালন, শিক্ষকের উপদেশ পালন, বৃদ্ধ মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের পরিচর্যা ও ভরণপোষণ, মাতা-পিতা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি কর্তব্যবোধের উদাহরণ। আমাদের পরিবার ও সমাজে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্তব্য রয়েছে।

মাতা-পিতার কর্তব্য সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করা। সন্তানকে স্নেহ-যত্নে বড় করে তোলা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। আবার সন্তানের কর্তব্য মাতা-পিতার আদেশ ও উপদেশ মেনে চলা। তাদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা। মাতা-পিতার সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকা।

কর্তব্য পালন ধর্মের অঙ্গ। ছাত্রের কর্তব্য অধ্যয়ন করা। সংস্কৃতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ। অর্থাৎ ছাত্রের একমাত্র কর্তব্য অধ্যয়ন করা। নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করলে জীবনে অনেক বড় হওয়া যায়। যেমন-একজন শিক্ষার্থী যথাযথ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। কর্তব্য পালনে যারা অবহেলা করে এবং অসচেতন থাকে তারা জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

একক কাজ : ছাত্র হিসেবে তোমার কর্তব্যসমূহ চিহ্নিত কর।

পাঠ-৬ : পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

সন্তান পরিবারের মধ্যেই লালিত-পালিত হয়। পরিবারে পিতা-মাতাই এই সন্তানকে বড় করে তোলে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানেরও ভূমিকা রয়েছে। বাল্য ও কৈশোরে আমরা পিতা-মাতার আদেশ ও উপদেশ মেনে চলি। পরিবারে আমরা মায়ের নানা কাজে সহায়তা করে থাকি। সন্ধ্যায় আমরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা আরতি দেই, পূজা করি। কখনো কখনো আমরা রান্নার কাজে মাকে সহায়তা করি। আবার বাবার কাজেও আমরা তাকে সহায়তা করে থাকি। পারিবারিক কাজে পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আমাদের পিতা-মাতা এতে আনন্দিত এবং সন্তুষ্ট হন। পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট ও আনন্দে রাখা আমাদের কর্তব্য।

আমরা পড়াশুনায় ভালো করলেও পিতা-মাতা খুশি হন। পিতামাতাকে খুশি রাখা আমাদের কর্তব্য।

কর্তব্যবোধ মানুষের মহৎ গুণ। ধার্মিক সর্বদাই কর্তব্যপরায়ন। বৃদ্ধ পিতা-মাতার পরিচর্যা ও ভরণপোষণও আমাদের কর্তব্য। পিতা কিংবা মাতার অবর্তমানে তাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করাও আমাদের কর্তব্য। যেমন-পিতার অবর্তমানে মা, ছোট ভাই-বোন, প্রতিবন্ধী ভাই-বোন লালন-পালন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আর্থিক সহায়তাদান, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করা প্রভৃতি আমাদের কর্তব্য। আমাদের সকলের উচিত পিতা-মাতার ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভূতির প্রতি অত্যন্ত সজাগ থাকা। পিতা-মাতা এতে খুশি হন। সুতরাং পিতা- মাতাকে খুশি ও আনন্দে রাখাও আমাদের কর্তব্য।

আমাদের সমাজ জীবনে দেখা যায় পিতার অবর্তমানে সম্পত্তি নিয়ে ভাই-ভাই ঝগড়া বিবাদ করে। পিতার অবর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারে বড়ভাই কিংবা অন্য কেউ সকলের ভরণ-পোষণসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন। পরিবারের শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে তারা পিতার মতোই ভূমিকা পালন করেন। এটিও সন্তানের কর্তব্য।

একক কাজ : পরিবারে পিতা-মাতার প্রতি আমরা কোন কর্তব্যগুলি পালন করে থাকি তা লেখ।

পাঠ-৭ : সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অশেষ। সন্তান গর্ভে ধারণ করা হতে ভূমিষ্ট পর্যন্ত মায়ের কষ্টের শেষ নেই। মায়ের এই কষ্টের মূল্য কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। মা আমাদের লালন-পালন করেন। ঘুম পাড়ানির গান গেয়ে আমাদের ঘুমের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। বাবা সন্তানের আনন্দের ও সুখের সব আয়োজনই করেন। সন্তান বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বে মা ও বাবা উভয়েই সন্তানকে প্রস্তুত করে তোলেন। মা সন্তানকে মুখে মুখে কত স্বরধ্বনি- অ, আ, উ প্রভৃতি উচ্চারণ শেখান, ছড়া বলেন, গল্প বলেন আরো কতো কী। মা-বাবা সন্তানকে হাতেখড়িদানের আয়োজন করেন। সন্তান বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মা বাবা তাদেরকে প্রস্তুত করে তোলেন। সন্তানের প্রতি মা- বাবার এ ধরনের আচরণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে এমনিতেই আসে।

সন্তান একদিন বিদ্যালয়, কলেজ পড়া শেষ করে উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। সন্তানের প্রতি মা-বাবার প্রত্যাশাও বাড়তে থাকে। সন্তানের ভবিষ্যত গড়ার সব আয়োজনে তাঁদের স্বপ্ন ও চেষ্টার শেষ থাকে না। সন্তানকে মা-বাবা তাঁদের স্বপ্নের কথা বলেন। সন্তান নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন। সন্তানের ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্নকেও মা-বাবা একধাপ এগিয়ে দেন। এখানেও মা-বাবা সন্তানের ভবিষ্যত গড়ার পথ প্রদর্শক। ধর্মে মা-বাবাকে সন্তান গড়ার কারিগর বলা হয়েছে।

সন্তানের চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনে মা-বাবা নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মা ও বাবা সব সময়ই চান

তাঁদের সন্তান হবে আদর্শবান, সৎ, নির্ভিক, সদালাপি ও চরিত্রবান। পারিবারিক জীবনে সকল মা-বাবাই তাঁদের সন্তানকে এভাবে দেখতে চান এবং এ লক্ষ্যেই দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া নিজ কন্যা সন্তানকে সৎপাত্রে দান এবং পুত্রের জন্য সৎ পাত্রী নির্বাচন করে বিবাহের দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা-বাবাই পালন করে থাকেন। সুতরাং সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। মা-বাবাকে আমাদের ধর্মে দেব-দেবীর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

একক কাজ : ভবিষ্যত জীবন গড়ার ক্ষেত্রে তোমার মা-বাবা কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছেন তা চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে .... নির্দেশ দেয়।
২. ধর্ম হচ্ছে .... শক্তি।
৩. বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাদের ....।
৪. ভক্তিতে থাকে .... ভালোবাসা এবং পুণ্য।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বামপাশ	ডানপাশ
১. ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে এক কথায়	গুরুজন
২. মা-বাবার স্থান আমাদের জীবনে	পিতাহি পরমন্তপঃ
৩. ছাত্রের কর্তব্য	বলা হয় ধর্মবিশ্বাস
৪. শিক্ষকগণও আমাদের	সবার উপরে
৫. পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ	অধ্যয়ন করা
	বিশ্বাস দৃঢ় করে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. **গণেশের বাহন কী?**

ক. হাঁস খ. পেঁচা
গ. ইঁদুর ঘ. ময়ূর

২. **পিতা প্রীত হলে কারা তুষ্ট হন?**

ক. জ্ঞানীরা খ. সাধকেরা
গ. ঋষিরা ঘ. দেবতারা

৩. বাঁধন প্রতিদিন সকালে তার আরাধ্য দেবতার পূজা না করা পর্যন্ত অন্য কোন কাজ করে না। এখানে বাঁধনের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-

i. ধর্ম বিশ্বাস
ii. মঙ্গলচিন্তা
iii. কুসংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আমরা ধর্মবিশ্বাস করব কেন?
২. 'গুরুজনে ভক্তি' ধারণাটি উদাহারণসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. গুরুজনের প্রতি ভক্তির উপায়সমূহ লেখ।
৪. কর্তব্যবোধের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ধর্মপালনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
২. ধর্মাচরণে ভক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্যসমূহ চিহ্নিত কর।
৪. গণেশের মাতৃভক্তির শিক্ষা তুমি ব্যক্তি জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে? ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বিধান ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনিই ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। এদিকে ডাক্তার বলেছেন যে, তার পিতাকে সুস্থ করে তুলতে পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে। কোনো উপায় না দেখে বিধানের মা হতাশ হয়ে পড়েন। বিধান এমন পরিস্থিতিতে মনোবল হারায়নি। সে নিজে একটি কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগদান করে। দুইটি সম্প্রচার মাধ্যমে আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রেরণ করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের অসহায়ত্বের বর্ণনা করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে। ভালো হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বাবাকে সে সুস্থ করে তোলে। বাবা সুস্থ হয়ে বিধানের পড়াশুনা ঠিকমত চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। শেষ পর্যন্ত ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে নিজেদের বাড়িটিও বিক্রি করে দেন। বিধান আজ সমাজে সু-প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার।

ক. কার্তিকের বাহন কী?
খ. মানুষের ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. বিধানের পিতার মধ্যে 'ধর্মবিশ্বাস' পরিচ্ছেদের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বিধানের মধ্যে 'গুরুভক্তি' কাজ করেছে কি? 'ধর্মবিশ্বাস' পরিচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

প্রতিদিনের কাজকেই বলা হয় নিত্যকর্ম। যেমন- প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য প্রণাম একটি নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম মেনে চললে একদিকে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায় অপরদিকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ঈশ্বর আরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে যোগ। যোগ বলতে বোঝায় ভগবান ও তাঁর সত্যচেতনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। আসন হচ্ছে যোগের একটি অঙ্গ। স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নামই আসন। যোগাসন অনুশীলনে কতগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। তবেই এর সুফল পাওয়া যায়। নিয়মিত যোগাসন অনুশীলনে দেহকে বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে রাখা যায়।

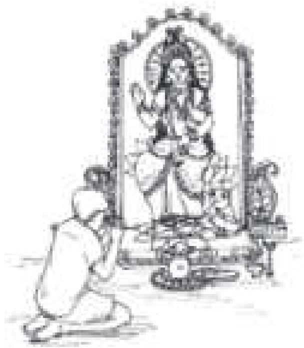

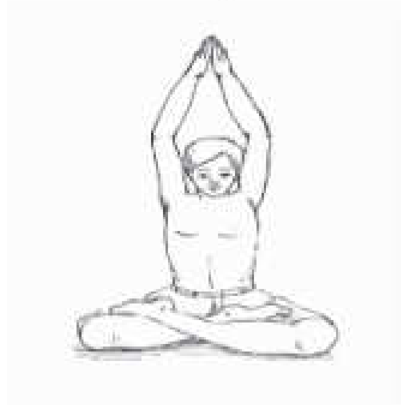

ফলে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়ে ওঠে এবং মনও হয়ে ওঠে আনন্দ ও শান্তিময়। সুতরাং দেহ ও মনকে সুস্থ রাখতে আসনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে নিত্যকর্ম ও যোগাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- নিত্যকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিত্যকর্মের একটি মন্ত্র বা শ্লোক সরলার্থসহ বলতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জীবনাচরণে নিত্যকর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- যোগাসনের ধারণা, সাধারণ নিয়ম ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শবাসন ও সিদ্ধাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে এবং অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- শরীর-মন গঠনে শবাসন ও সিদ্ধাসনের গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নিত্যকর্ম ও শবাসন অনুশীলন করতে উদ্বুদ্ধ হব;
- নিত্যকর্ম ও শবাসন অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ ১ : নিত্যকর্মের ধারণা ও মন্ত্র

এই পৃথিবী বিরাট কর্মক্ষেত্র। এখানে সকলকেই কিছু না কিছু কর্ম করতে হয়। কেননা জাগতিক কর্ম ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না। তাই কর্মকে জীবন এবং ধর্ম বলা যায়। আমরা প্রতিদিন যে সকল কাজ করে থাকি তাই 'নিত্যকর্ম'।

'নিত্য' অর্থ প্রত্যহ বা প্রতিদিন। 'কর্ম' মানে কাজ। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নিত্যকর্ম বলতে বোঝায় প্রতিদিন যে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। প্রতিদিনের কর্মসূচি ঠিক করে নিয়মিতভাবে তা পালন করতে হয়। মোটকথা প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠে সারাদিন ধরে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয় সেগুলোকে নিত্যকর্ম বলে

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বর ও গুরুর নাম স্মরণ করা, পিতামাকে প্রণাম করা, হাত মুখ ধুয়ে স্নান করে পূজা ও উপাসনা করা, লেখাপড়া, খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা ইত্যাদি।

নিত্যকর্মের মন্ত্র :

প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যপ্রণাম একটি নিত্যকর্ম। সূর্যকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম জানাতে হয় :

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

সরলার্থ : কশ্যপের পুত্র, জবা ফুলের মতো রক্তবর্ণ, মহাদ্যুতিময়,অন্ধকার দূরকারী, সর্বপাপ বিনাশকারী সূর্যকে আমি প্রণাম জানাই।

দলীয় কাজ :
* সূর্য দেবতার প্রণাম মন্ত্রটি আবৃত্তি কর।
* সূর্য দেবতার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
* প্রতিদিনের নিত্যকর্মের একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : জাগতিক, স্মরণ, সঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং, মহাদ্যুতিম্, ধ্বান্তারিং, সর্বপাপঘ্নং, প্রণতোঽস্মি ।

পাঠ ২ : নিত্যকর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব

নিত্যকর্ম করলে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। সময়ের কাজ সময়ে শেষ হয়; কোনো কাজই একেবারে অসমাপ্ত পড়ে থাকে না। কাজে নিষ্ঠাবান হওয়া যায় এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং আহার গ্রহণে শরীর ভালো থাকে। শরীর সুস্থ থাকলে মন ভালো থাকে। মন ভালো থাকলে পরিবেশকে ভালো লাগে এবং সকল কাজে ধৈর্যের সাথে মনোনিবেশ করা যায়। নিয়মিত পিতা-মাতাকে প্রণাম করলে

তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সুগভীর হয়। মানুষের প্রতি প্রীতি জন্মে। নিয়মিত অধ্যয়ন করলে ভালো ফলাফল করা যায়। জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং জীবনে সফলতা আসে। নিয়মিত পূজা ও উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে সন্তুষ্ট করা হয়। তাই আমরা গৃহে দেবতার বিগ্রহ বা প্রতিমা স্থাপন করে প্রতিদিন পূজা করি। আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা করি। এভাবে নিয়মিত পূজা ও উপাসনার ফলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সুগভীর হয় এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত একটি সুন্দর জীবন যাপনের পথ অনুসন্ধান করা। সুতরাং আমরা নিত্যকর্মের নিয়মাবলি মেনে চলব এবং নিজের কাজে নিষ্ঠাবান থাকব। আমাদের হৃদয়ে থাকবে সুগভীর ঈশ্বরভক্তি।

দলীয় কাজ : * নিত্যকর্ম মেনে চলার পক্ষে পাঁচটি যুক্তি লেখ।
* নিত্যকর্ম মেনে না চললে কী কী অসুবিধা হতে পারে?- তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নিষ্ঠাবান, সমৃদ্ধ, সান্নিধ্য, ধৈর্য, প্রীতি, অধ্যয়ন, অনুসরণ।

পাঠ ৩ : যোগাসনের ধারণা

ঈশ্বর আরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে 'যোগ'। সাধারণভাবে 'যোগ' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত করা। ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ঈশ্বরের যোগসাধন করা। 'যোগ' শব্দটি সংস্কৃত 'যুজ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর প্রধান অর্থ হলো মিল। যোগক্রিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন ঘটায়। আবার চিত্ত নিবৃত্তির এক নাম হলো যোগ। যোগ দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগ' শব্দের অর্থ করেছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ। সুতরাং যোগ বলতে বোঝায়, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে নিষ্কামভাবে ভগবানের সঙ্গে ও তাঁর সত্য চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

যোগের আটটি অঙ্গ। যথা-

১। যম - যম মানে সংযমী হওয়া।

২। নিয়ম - শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া। নিয়মিত ও পরিমিত স্নান, আহার ও বিশ্রাম করা।

৩। আসন - বিশেষ ভঙ্গিতে বসাকে আসন বলে।

৪। প্রাণায়াম - শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিকে প্রাণায়াম বলে।

৫। প্রত্যাহার - মনকে বহির্মুখী হতে না দিয়ে অন্তর্মুখী করাকে প্রত্যাহার বলে।

৬। ধারণা - কোনো এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।

৭। ধ্যান - কোনো এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

৮। সমাধি - ধ্যানস্থ অবস্থায় মন যখন ইষ্টচিন্তায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকে তখন সে অবস্থাকে বলা হয় সমাধি।

একক কাজ : যোগের অঙ্গগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।

আসন যোগের তৃতীয় অঙ্গ। স্থিরসুখমাসনম্ - স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নামই আসন। সুতরাং যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না, তাকে যোগাসন বলে।

ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে দেহ এবং মন উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে ধর্ম সাধনা অগ্রসর হয়। তাই দেহকে সুস্থ রাখা সাধনার পূর্বশর্ত। আর যোগাসন হচ্ছে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার একটি প্রক্রিয়া। সেজন্য প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে যোগাসন অনুশীলনের বিধান দিয়ে গেছেন। যোগাসনের সংখ্যা অনেক, যেমন- শবাসন, সিদ্ধাসন, গোমুখাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি।

একক কাজ : দেহ ও মনের সাথে যোগাসনের সম্পর্ক চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : জীবাত্মা, পরমাত্মা, যোগক্রিয়া, চিত্ত নিবৃত্তি, মহর্ষি, চেতনা, সংযমী, প্রাণায়াম, একাগ্র, অবিচ্ছিন্ন, আরাধনা, বিধান, প্রক্রিয়া, শবাসন, সিদ্ধাসন।

পাঠ ৪ : যোগাসনের সাধারণ নিয়ম ও গুরুত্ব

যোগাসনের সাধারণ নিয়ম :

যোগাসন অনুশীলন করতে হলে অবশ্যই কতগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন-

১। নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার। সকাল ও সন্ধ্যায় যোগাসন অনুশীলন করা ভালো।

২। ভরা পেটে অথবা একেবারে খালি পেটে আসন অভ্যাস করা ঠিক নয়। সামান্য কিছু হালকা খাবার খেয়ে কিছুটা সময় পরে যোগাসন অভ্যাস করতে হবে।

৩। নরম বিছানার ওপর আসন অভ্যাস করা যাবে না। মেঝের উপর কম্বল, শতরঞ্জি বা ঐ জাতীয় কিছু বিছিয়ে আসন অনুশীলন করতে হবে।

৪। যোগাসন কোনো নির্জন স্থানে বা নিভৃত কক্ষে আলো - বাতাস যুক্ত স্থানে করা দরকার, যেন কোনো বাধা বিপত্তি না আসে।

৫। আসন করার সময় আঁটসাঁট ভারি পোশাক না পরে ঢিলেঢালা হালকা পোশাক পরা উচিত।

৬। আসন অভ্যাস করার সময় মনকে ধীর, স্থির, শান্ত ও প্রফুল্ল রাখতে হয়।

৭। আসন অভ্যাসকালে শ্বাস - প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

৮। আসন অবস্থায় মুখে যেন কোনো বিকৃতি না আসে।

৯। আসন অভ্যাসকালে জোর করে বা ঝাঁকুনি দিয়ে কোনো ভঙ্গিমা বা প্রক্রিয়া করা ঠিক নয়।

১০। নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকটি আসন করার পর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

দলীয় কাজ : যোগাসনের নিয়মাবলির একটি তালিকা তৈরি কর।

যোগাসনের গুরুত্ব :

নিয়মিত যোগাসনে দেহে স্থিরতা আসে, দেহ সুস্থ থাকে এবং দেহ লঘুভার হয়। আসন কোনো জিমন্যাস্টিক ব্যায়াম নয়, শুধুই দেহভঙ্গি। এ দেহভঙ্গিতে দেহের প্রতিটি পেশি, স্নায়ু ও গ্রন্থির ব্যায়াম হয়। তাতে দেহ ও মনের কর্মতৎপরতা, সুস্থিতি, সহিষ্ণুতা ও জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। আসনে দেহের গঠন সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়, দেহ বলশালী ও নমনীয় হয় এবং দেহ রোগমুক্ত থাকে। দেহের রক্ত প্রবাহ বিশুদ্ধ হয়। দেহের মেদ কমাতে, শীর্ণতা দূর করতে যোগাসন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যোগাসন দেহের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে। যোগাসনে আত্মা ও মন একই কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ হওয়ার ফলে চিত্তচাঞ্চল্য কমে। আসনের প্রকৃত গুরুত্ব এই যে, আসন মনকে বশে এনে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়। যোগসাধক প্রথমে আসনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য লাভ করেন তারপর তিনি অধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত হন। তিনি তাঁর সমস্ত কর্ম ও ফল বিশ্বসেবায় ঈশ্বরে সমর্পণ করেন।

দলীয় কাজ : যোগাসন অনুশীলনের প্রভাব লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : শতরঞ্জি, বিধেয়, প্রফুল্ল, বিকৃতি, লঘুভার, পেশি, স্নায়ু, গ্রন্থি, কর্মতৎপরতা, সুস্থিতি, সহিষ্ণুতা, নমনীয়, শীর্ণতা, অবসাদ, চিত্তচাঞ্চল্য, অধ্যাত্ম, সমর্পণ।

পাঠ ৫ : শবাসনের ধারণা ও অনুশীলন পদ্ধতি

'শব' শব্দের অর্থ মৃতদেহ। মৃতব্যক্তির মতো নিস্পন্দ ভাবে শুয়ে যে আসন করা হয় তার নাম শবাসন। মৃতব্যক্তির যেমন তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না, তেমনি শবাসন অবস্থায় আসনকারীর দেহের কোন অংশে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

শবাসনের লক্ষ্য মৃতদেহের মতো নিশ্চল নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকা, কিন্তু চেতনা হারানো নয়।

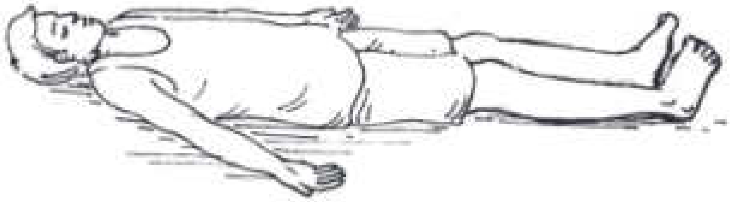

শবাসন

অনুশীলন পদ্ধতি :

মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটি লম্বা করে দিতে হবে। পা দুটোর মধ্যে প্রায় এক ফুটের মতো ফাঁকা থাকবে এবং হাত দুটোকেও লম্বালম্বিভাবে শরীরের দু-পাশে উরু থেকে একটু দূরে রাখতে হবে। হাতের পাতা উপরের দিকে খোলা থাকবে। চোখ বন্ধ, ঘাড় সোজা, গোটা শরীর শিথিল অবস্থায় থাকবে। এবার ধীরে ধীরে চার পাঁচ বার লম্বা শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। দৈনিক যোগাভ্যাসে কঠিন আসন করার পর বিশ্রামের জন্য এই আসন ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত করা উচিত। এছাড়া আলাদাভাবে অন্তত ১৫ মিনিট শবাসন করা প্রয়োজন।

একক কাজ : শবাসন অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ ৬ : শবাসনের গুরুত্ব ও প্রভাব

শরীর শিথিলকরণ বা বিশ্রামের জন্য শবাসন যোগসাধনার একটি উপযুক্ত আসন। এতে সম্পূর্ণ শরীরে সুস্থবোধ হয়, স্নায়ুমণ্ডলী ও শিরা উপশিরাগুলো সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়, শরীর ও মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। ফলে শরীর, মন, মস্তিষ্ক এবং আত্মা পূর্ণ বিশ্রাম, শক্তি, উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করে।

মানসিক টেনশন, বেশি বা কম রক্তচাপ, হৃদরোগ, পেটে গ্যাস, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগ উপশমের ক্ষেত্রে শবাসন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার পীড়নে মানুষের স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে, সেই চাপের সর্বোত্তম প্রতিষেধক শবাসন। অনিদ্রার জন্য এই আসন সর্বোত্তম। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে ৫-৭ মিনিট বা তার বেশি এই আসন করে আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসে। শরীর শিথিল করে দিয়ে বিশ্রাম করার এই কৌশল আয়ত্ত করলে ঘুমকেও জয় করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় আসনটি মানসিক চাপ কমাতে খুবই সহায়তা করে। অত্যধিক পড়াশুনার পর এই আসনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে অবসাদ, ক্লান্তি দূর হয়, নতুন উদ্যম ফিরে আসে, স্মৃতি শক্তিও বৃদ্ধি পায়। সাধকেরা এই আসনের সাহায্যে যোগনিদ্রা আয়ত্ত করে উচ্চস্তরের অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন। এই আসনে ধ্যানের স্থিতির বিকাশ হয়। যে কোনো আসন অনুশীলনের পর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হয়। আমরা যতক্ষণ একটি আসনের ভঙ্গিমায় থাকি তখন যতটা উক্ত আসনের উপকারিতা লাভ করি তার চেয়ে অনেক বেশি উপকৃত হই আসন অভ্যাসের পর শবাসন করে।

দলীয় কাজ : শবাসনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নিশ্চল, নিঃসাড়, শিথিল, উপশম, পীড়ন, প্রতিষেধক, উদ্যম, যোগনিদ্রা।

পাঠ ৭ : সিদ্ধাসনের ধারণা ও অনুশীলন পদ্ধতি

সাধনায় সিদ্ধ যোগীদের মধ্যে বিশেষভাবে অনুসৃত হওয়ার ফলে এই আসনের নাম সিদ্ধাসন হয়েছে। এই আসনটি সিদ্ধ যোগীগণ প্রায়ই করতেন বা করেন। এটি দেখতে সাধুদের ধ্যানের মতো। সেজন্য এই আসনকে সিদ্ধাসন বলা হয়।

অনুশীলন পদ্ধতি :

সিদ্ধাসন

সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে। এবার ডান পা হাঁটু থেকে গোড়ালি দু-পায়ের সংযোগ স্থলে স্পর্শ করে রাখতে হবে। তারপর বাঁ পা হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের উপর রাখতে হবে। দু-পায়ের গোড়ালি তলপেটের নিচে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। হাতের তালু উপর দিকে করে ডান হাতের কব্জি ডান হাঁটুর উপর আর বাঁ হাতের কব্জি বাঁ হাঁটুর উপর রাখতে হবে। দু-হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ছোঁয়াতে হবে। অন্য আঙুলগুলো সোজা থাকবে। তারপর পিঠ, ঘাড় আর মাথা সোজা রেখে চোখ বন্ধ করে দুই-ভ্রূয়ের মাঝে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা বদল করে আসনটি পাঁচ মিনিট অনুশীলন করতে হবে। শেষে শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

একক কাজ : সিদ্ধাসন অনুশীলন পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বল এবং বোর্ডে লেখ।

পাঠ ৮ : সিদ্ধাসনের গুরুত্ব ও প্রভাব

সিদ্ধাসনে শরীরের বিশ্রাম হয়। এই আসনে বসে থাকার ফলে শরীর যেমন বিশ্রাম পায়, তেমনি দুই পা আড়াআড়ি আর পিঠ সোজা থাকার ফলে মন স্থির ও তৎপর থাকে। হাঁটু আর গোড়ালির গাঁট শক্ত হয়ে গেলে এই আসনে উপকার পাওয়া যায়। এই আসনে কটিদেশে আর উদরাঞ্চলে ভালো রক্তসঞ্চালন হয় এবং এর ফলে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ আর পেটের ভেতরকার প্রত্যঙ্গগুলো সতেজ ও সবল হয়। কোমর ও হাঁটুর সন্ধিস্থল সবল হয়। এই আসন অভ্যাসে উদরাময়, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ দূর হয়। অর্শ রোগে এই আসন অত্যন্ত ফলপ্রদ। সিদ্ধাসনে বসে জপ, প্রাণায়াম ও ধ্যানধারণাদি অভ্যাস করলে সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

দলীয় কাজ : সিদ্ধাসন অনুশীলনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : অনুসৃত, সংযোগ, তর্জনী, গাঁট, কটিদেশ, উদরাঞ্চল, সতেজ, সন্ধিস্থল, উদরাময়, অর্শরোগ, ফলপ্রদ, সিদ্ধিলাভ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. এই পৃথিবী বিরাট .... ।
২. আমরা গৃহে দেবতার .... স্থাপন করে প্রতিদিন পূজা করি ।
৩. দেহকে সুস্থ রাখা .... পূর্বশর্ত ।
৪. যোগাসন অনুশীলনের নির্দিষ্ট .... থাকা দরকার ।
৫. ধ্যান হচ্ছে কোন এক বিষয়ে .... অবিচ্ছিন্ন চিন্তা ।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং আহার গ্রহণে	সংযমী হওয়া
২. আসন কোন জিমন্যাস্টিক	সিদ্ধাসন
৩. যম শব্দের অর্থ	ব্যায়াম নয় শুধু দেহ ভঙ্গি
৪. সাধুদের ধ্যানের মতো দেখতে	শরীর ভালো থাকে
	মনকে একাগ্র করা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. যোগদর্শনের প্রণেতা কে?

ক. বশিষ্ঠ খ. পতঞ্জলি
গ. রামকৃষ্ণ ঘ. বামাক্ষেপা

২. আমরা যোগাসন অনুশীলন করি, কারণ এর ফলে -

i. শরীর সুস্থ থাকে
ii. মনে স্থিরতা আসে
iii. জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাগর প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠে এবং বাইরে এসে পূর্বমুখী হয়ে হাত জোড় করে মন্ত্রপাঠ করে। এরপর নিয়মানুসারে প্রাত্যহিক কাজগুলো সম্পাদন করে।

৩. **সাগর প্রতিদিন কোন দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে মন্ত্র পাঠ করে?**

ক. অগ্নি খ. সূর্য

গ. বায়ু ঘ. ইন্দ্র

৪. **সাগরের প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে ফুটে উঠেছে -**

i. নিষ্ঠা

ii. ঈশ্বর ভক্তি

iii. নিয়মানুবর্তিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. 'নিত্যকর্ম করলে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়'- কথাটি তোমার নিজ কর্ম অনুশীলনের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. শবাসন অনুশীলনের প্রভাব চিহ্নিত কর।

৩. সিদ্ধাসনের দুটি প্রভাব লেখ।

৪. নিত্যকর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

৫. যোগাসন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী জয়িতা খুবই চঞ্চলমতি। লেখাপড়ায় মনোযোগ কম। পরীক্ষা আসলে রাত জেগে পড়াশুনা করে। এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষার ফলাফলও ভালো হয় না। জয়িতার মামা বেড়াতে এসে এ অবস্থা দেখে তাকে আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন। জয়িতা এর মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পড়ালেখায় মনোযোগী হয়।

ক. 'যোগ' শব্দটি কোন ধাতু থেকে এসেছে?

খ. যোগাসন বলতে কী বোঝায়?

গ. জয়িতা কোন আসন অনুশীলনের মাধ্যমে পড়ালেখায় মনোযোগী হয়েছে? এই আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর জয়িতা উক্ত আসন অনুশীলনে বেশি উপকৃত হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বরের সাকার রূপকে দেব-দেবী বলে। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি। এ সকল দেব- দেবী ঈশ্বরের বিশেষগুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। এই শক্তি বা গুণ লাভ করার জন্য আমরা দেব-দেবীর পূজা করি।

পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূপকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে স্তুতি করা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দ। অর্থাৎ যে উৎসবগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে, এমন ধরনের অনুষ্ঠানকে পার্বণ বলে অভিহিত করে থাকি। এ অধ্যায়ে দেব-দেবীর ধারণা, পূজা-পার্বণের ধারণা, পূজার গুরুত্ব, গণেশ দেব ও সরস্বতী দেবীর পূজা পদ্ধতি, পূজার শিক্ষা ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- দেব-দেবী সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- পূজা-পার্বণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- দেব-দেবীর পূজার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- গণেশ দেবের পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- গণেশ দেবের প্রণাম মন্ত্রসহ সরলার্থ বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনাচরণে গণেশ দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- সরস্বতী দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- সরস্বতী পূজার প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র সরলার্থসহ বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব
- সমাজ ও নিজ জীবনে সরস্বতী পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- গণেশ ও সরস্বতী পূজায় উদ্বুদ্ধ হব ।

পাঠ ১: দেব-দেবীর ধারণা

ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাঁদের দেব-দেবী বলে । অর্থাৎ দেব-দেবীরা ঈশ্বরের সাকার রূপ । যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি । তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণের অধিকারী । ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু প্রতিপালন করেন এবং শিব ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন । আবার সরস্বতী বিদ্যার দেবী, গণেশ সফলতার দেবতা । এরকম অনেক দেব-দেবী রয়েছেন ।

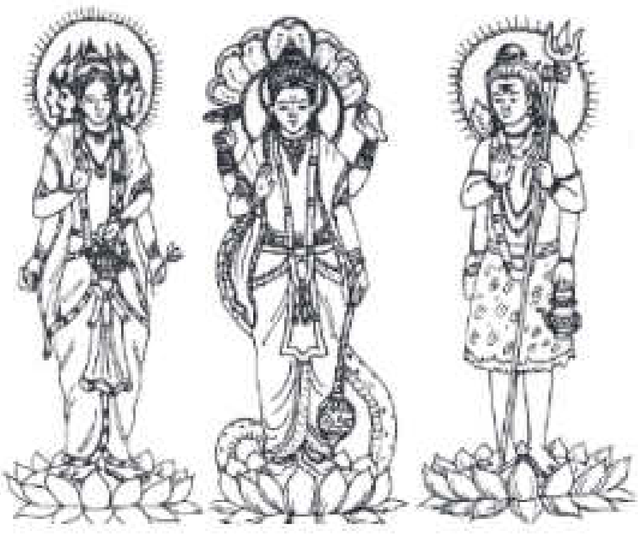

এ সকল দেব-দেবীর পূজার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই । তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি প্রার্থনা করি । প্রার্থনায় দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হন । আমাদের মঙ্গল করেন ।

নতুন শব্দ: প্রতিপালন, ভারসাম্য ।

পাঠ ২ : পূজা-পার্বণের ধারণা

পূজা

সাধারণ অর্থে পূজা বলতে প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে বোঝায় । কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা সাকার উপাসনার পদ্ধতি । এক্ষেত্রে দেব-দেবীর প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করার জন্য তাঁদের সেবা, স্তুতি ও গুণকীর্তন করে প্রণাম করা হয় । নিবেদন করা হয় পুষ্প-পত্র , ধূপ-দীপ, জল, ফল ইত্যাদি নৈবেদ্য । জীবের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয় । একত্রে এ বিষয়গুলোকে পূজা বলে ।

পূজার আচরণগত দিক বলতে পূজা করার রীতি-নীতিকে বোঝানো হয় । অর্থাৎ পূজা কীভাবে করতে হবে, কীভাবে প্রতিমা নির্মাণ করতে হবে, কীভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, কী কী উপাচারের প্রয়োজন হবে ইত্যাদি বিষয় পূজার আচরণগত দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । দেশ ও অঞ্চল ভেদে পূজা পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে । তবে পূজা করার মৌলিক দিকগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । আবাহন, অর্ঘ প্রদান, ধ্যান, পূজামন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ । আমরা প্রতিদিন পূজা করি । আবার প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস বা বছরের বিশেষ বিশেষ সময়েও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার আয়োজন করে থাকি । দেব-দেবী অনুসারে পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । তবে যে-কোনো দেব-দেবীর পূজা করার ক্ষেত্রে কতগুলো সাধারণ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হয় । এই নিয়ম-নীতিগুলোকে সাধারণভাবে পূজাবিধি বলে ।

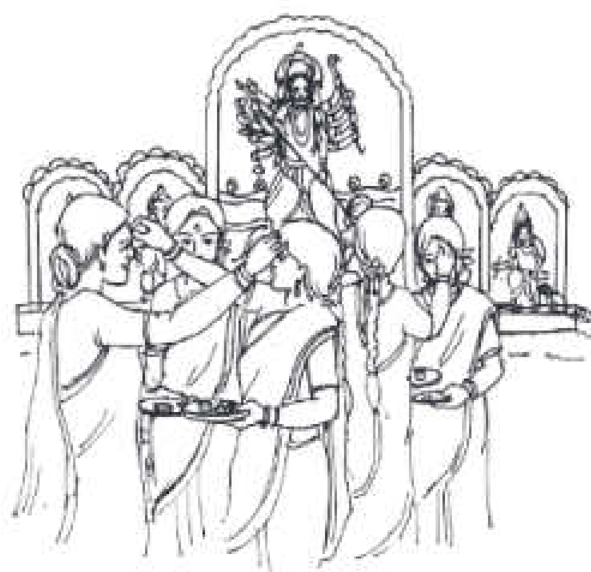

পার্বণ

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব । উৎসব মানে আনন্দময় অনুষ্ঠান । পার্বণ বলতে আমরা বুঝি, যেসব

পর্ব পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে। যেমন– প্রতিমা নির্মাণ, দেবতার ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন, বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, করতাল,

কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি: ভক্তদের সাথে ভাব বিনিময়, কিছুটা বিচিত্রধর্মী খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ইত্যাদি।

একক কাজ : পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে এমন পাঁচটি আয়োজন সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ: নৈবেদ্য, উপাচার, অর্ঘ, পুষ্পাঞ্জলি, পার্বণ।

পাঠ ৩: দেব-দেবীর পূজার গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বাস করাই মানুষের প্রকৃতি। ধর্ম সমাজকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলে। আধ্যাত্মিক ও আর্থসামাজিক দিক থেকে পূজা-পার্বণ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। পূজা-পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলনের সৃষ্টি হয়। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসবমুখর।

প্রতিমা আনয়ন, পূজার উপকরণ সংগ্রহ, মন্দিরে পূজার সাজসজ্জা, ধূপের গন্ধ, আরতি, প্রসাদ বিতরণ, নতুন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি আমাদের মনে সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর ফলে আমাদের মনে শুভ্রতা সৃষ্টি হয় এবং ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের ভাব জাগ্রত হয়।

পূজা আমাদের আত্মাকে পবিত্র করে, মনকে সুন্দর করে এবং অভীষ্ট দেবতার প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তি জাগ্রত করে। পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেমন– ধর্মীয় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি। অনেকে স্মরণিকাও প্রকাশ করে থাকেন। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে এসব আয়োজন আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

পূজা পার্বণে সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে উন্নত খাবার-দাবারের অয়োজন করা হয় এবং ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়া হয়। ফলে পরিবারিক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে পূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন পূজায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের অংশবিশেষ প্রয়োজন হয় যা পূজা উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে শিশুরা শৈশব থেকেই বিভিন্ন ধরনের গাছ-পালার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হয়।

দলগত কাজ: ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দেব-দেবীর পূজার প্রভাব লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ: আধ্যাত্মিক, উৎসবমুখর, সৌহার্দ্য, স্মরণিকা।

পাঠ ৪ : গণেশদেব

গণেশ দেবের পরিচয়

গণেশ দেব সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা। গণেশ দেব গণপতি, গজানন, হেরম্ব, বিনায়ক প্রভৃতি নামেও পরিচিত। গণেশের শরীর মানুষের মতো। তার ওপর গজ বা হাতির মাথা বসানো। এজন্য গণেশকে গজানন বলা হয়। তাঁর চার হাত, তিন চোখ। লম্বা তাঁর উদর, স্থূল বা মোটা তাঁর শরীর। তিনি একটু বেঁটে। গণেশের বাহন ইঁদুর।

দেবতা হিসেবে গণেশ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে মানুষের সকল প্রচেষ্টায় সফলতা দান করেন। এ কারণে যে-কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে দেবতা গণেশের পূজা করা হয়। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নববর্ষে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতা হিসেবে গণেশের পূজা করেন।

গণেশ দেবের পূজা পদ্ধতি

দুর্গাপূজা ও বাসন্তীপূজার সময় এবং ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থ তিথিতে বিশেষভাবে গণেশ দেবের পূজা করা হয়। এ ছাড়া যে কোনো পূজা করার আগে গণেশ দেবের পূজা করার রীতি রয়েছে। পূজা যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। পূজা করার বিধিসমূহ অনুসরণ করতে হয়। গণেশ পূজায় তুলসীপত্র নিষিদ্ধ।

গণেশ দেবের প্রণাম মন্ত্র

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥

সরল অর্থ : যিনি এক-দাঁত-বিশিষ্ট, যাঁর শরীর বিশাল, লম্বা উদর, যিনি গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী, সেই হেরম্বদেব গণেশকে প্রণাম জানাই।

গণেশ দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

গণেশ দেবকে সিদ্ধিদাতা বলা হয়। এই সিদ্ধি শব্দটির অর্থ সাফল্য, পারদর্শিতা বা কৃতকার্যতা। আর সিদ্ধিদাতা

শব্দটির অর্থ সফলতাদায়ক। গণেশ দেব আমাদের সফলতাদানের দেবতা। আমরা বিদ্যালাভ, ব্যবসাসহ সকল কর্মে সফলতা অর্জনের প্রত্যাশায় গণেশ দেবের পূজা করি। এ পূজার শিক্ষা হলো ভক্তিতে সাফল্যলাভ। এই ভক্তির মূলে রয়েছে শুদ্ধতা, একাগ্রতা, সংযম ও শৃঙ্খলা। তাই আমাদের জীবনের সাফল্য, পারদর্শিতা বা কৃতকর্মে প্রয়োজন শুদ্ধমনে মঙ্গল কামনা, কর্মে একাগ্রতা, ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা। যারা গণেশ দেবের এ শিক্ষা নিজ কর্মে প্রয়োগ করেন তারাই সাফল্য লাভ করেন। হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা বাংলা নববর্ষের প্রথম মাসের শুরুতেই গণেশ দেবের পূজা করেন। এই দেবের কৃপাতেই ব্যবসায় সফলতা অর্জিত হয়। ভক্তিভরে আমরা এই দেবের পূজা করি।

একক কাজঃ গণেশ দেবের পূজার শিক্ষা তোমার জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করতে পার ? ব্যাখ্যা কর।

নতুন শব্দ : সিদ্ধিদাতা, মহাকায়ং, লম্বোদরং, গজানন, হেরম্ব, বিঘ্ন।

পাঠ ৫ : সরস্বতী দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি

সরস্বতী দেবী বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার দেবী। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী, বিরজা, সারদা, ব্রাহ্মী, শতরূপা, মহাশ্বেতা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। সরস্বতীর বর্ণ চন্দ্রের কিরণের মতো শুভ্র। তাঁর হাতে আছে বীণা ও পুস্তক। রাজহংস তাঁর বাহন।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। দেবী সরস্বতী শুভ্র বসন পরিহিতা। সাদা পদ্ম ফুল তাঁর আসন। সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজার আয়োজন করা হয়। সরস্বতী পূজা পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে করা যায়। স্কুল-কলেজ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সাড়ম্বরে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। সাকার রূপে প্রতিমার মাধ্যমে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি হিসেবে পূজার মণ্ডপ সাজানো, উপকরণ সংগ্রহ, সংকল্প গ্রহণ, আমন্ত্রণ জানানো বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বসার আসন বা সিংহাসন সমর্পণ, পা ধোয়ার জন্য জল সমর্পণ, হাত ধোয়ার জল সমর্পণ, আচমন বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রতঙ্গ শুদ্ধকরণ প্রভৃতি সাধারণ পূজাবিধি অনুসারে সম্পাদন করা হয়। সরস্বতী দেবীর পুষ্পাঞ্জলির জন্য লাল রঙের ফুলের প্রয়োজন হয়। পলাশ ফুল সরস্বতী দেবীর প্রিয় ফুল।

সরস্বতী দেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র :

ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ।।
এষ সচন্দন-বিল্বপত্র-পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ

সরলার্থ : দেবী সরস্বতী, ভদ্রকালীকে নিত্য প্রণাম করি। প্রণাম জানাই বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ইত্যাদি বিদ্যাস্থানকে এবং এ স্থানকে সর্বদা প্রণাম করি। এই চন্দন যুক্ত বিল্বপত্র ও পুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে শ্রী শ্রী সরস্বতী দেবীকে প্রণাম জানাই।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।

সরলার্থ: হে মহীয়সী বিদ্যাদেবী সরস্বতী, পদ্মফুলের মতো তোমার চক্ষু, তুমি বিশ্বরূপা। হে বিশাল চক্ষুধারণকারী দেবী, তুমি বিদ্যা দান কর। তোমাকে প্রণাম করি।

নতুন শব্দ : বেদান্ত, বেদাঙ্গ, বিশালাক্ষি, কমললোচন, মহাশ্বেতা, ব্রাহ্মী, আচমন।

পাঠ ৬ : সরস্বতী দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

সরস্বতী বিদ্যার দেবী। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মনের অজ্ঞতা দূর করা এবং জ্ঞান বিকাশের জন্য বিদ্যাদেবী সরস্বতীর পূজা করেন। এর মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বেড়ে যায়। সামাজিক দিক থেকে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব রয়েছে। স্কুল-কলেজের হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা এ দিনটি গভীর ভক্তিভরে উদযাপন করে থাকে। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কাছে বিনীতভাবে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে এবং প্রার্থনা করে মা যেন তাদের বিদ্যা দান করেন।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির পূজারীরা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দেয়ার জন্য একত্রিত হন এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন যা জ্ঞান বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করেন এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। এ সুসম্পর্ক সমাজকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতেও সহায়তা করে।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে পূজারীদের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের একাগ্রতা ও মনোবল অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং তা একজন পূজারীর নৈতিকতাকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন অর্জনের শক্তি যোগায়।

একক কাজ : তুমি কীভাবে সরস্বতী পূজা উদযাপন করে থাকো।

নতুন শব্দ: সমৃদ্ধশালী, কুশল, মনোবল।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. দেবতারা ঈশ্বরের .... রূপ।

২. সরস্বতী .... দেবী।

৩. সকলে মিলে পূজা করলে পূজা হয়ে ওঠে .... ।

৪. পূজা-পার্বণের মাধ্যমে .... মিলনের সৃষ্টি হয়।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বামপাশ	ডানপাশ
১. বিষ্ণু	তুলসী পাতা নিষিদ্ধ
২. সরস্বতী	লাল ফুলের প্রয়োজন হয়
৩. গণেশ পূজায়	সফলতার দেবতা
৪. সরস্বতী দেবীর পূজায়	আমাদের প্রতিপালন করেন
৫. গণেশ	অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়
	বিদ্যাদান করেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন দেবতা ধ্বংসে করে ভারসাম্য রক্ষা করেন?

ক. ব্রহ্মা খ. বিষ্ণু

গ. শিব ঘ. গণেশ

২. পূজার মাধ্যমে মানুষের মনে জাগ্রত হয়-

i. ভ্রাতৃত্ববোধ

ii. অন্তরের পবিত্রতা

iii. বিলাস জীবন যাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী সৌরভ বিদ্যার্জন ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সকাল থেকে উপবাস করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে দেবীকে প্রণতি জানায়।

৩. **সৌরভ কোন দেবীকে প্রণতি জানিয়েছে?**

ক. লক্ষ্মী   খ. সরস্বতী

গ. দুর্গা   ঘ. মনসা

৪. **উক্ত পূজার শিক্ষা থেকে সৌরভ যে নৈতিক জ্ঞান অর্জন করবে তা হলো-**

ক. সামাজিক সম্প্রীতি সামাজিক বন্ধনের পূর্বশর্ত

খ. বিদ্যার্জন ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

গ. সমৃদ্ধি অর্জনই উন্নতির সোপান

ঘ. আসুরিক শক্তির বিনাশই শান্তি লাভের উপায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. পূজার মৌলিক উপাদানগুলো কী?

২. পূজা ও পার্বণের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. সরস্বতী দেবীর পরিচয় দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. পূজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

২. গণেশ পূজা থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করে থাকি? -এ শিক্ষার প্রয়োগ চিহ্নিত কর।

৩. সরস্বতী পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত কর।

২০২৫

সৃজনশীল প্রশ্ন:

দীপ্ত বিদ্যায় সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিবছর প্রতিমা নির্মাণ করে। সে বিশেষ আয়োজনে বাড়িতে সরস্বতী পূজা করে। এ পূজায় বহুলোকের সমাগম ঘটে। আবার দীপ্তর বাবা ব্যবসায়ের সাফল্য কামনা করে প্রতিদিন সকালে দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। তাছাড়া তিনি সকল বাধাবিঘ্ন দূর করার উদ্দেশ্যে বছরের নির্ধারিত দিনে বিশেষভাবে এ পূজা করে থাকেন। এ পূজাতেও সমাজের বিভিন্ন লোকের সমাগম ঘটে। দীপ্ত ও তার বাবা উভয়েই নিজ নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে ভক্তি সহকারে পূজা সম্পন্ন করে তৃপ্ত হয় এবং পূজা উপলক্ষে তাদের বাড়িটি একটি সামাজিক মিলন মেলায় পরিণত হয়।

ক. পূজা শব্দের অর্থ কী?

খ. আমরা পূজা করি কেন ব্যাখ্যা কর।

গ. দীপ্তর বাবা কোন দেবতার পূজা করেন? উক্ত দেবতার পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ঘ. দীপ্ত এবং তার বাবার নিবেদনকৃত দেব-দেবীর পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাবের তুলনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

'নীতি' শব্দ থেকে 'নৈতিক' শব্দের উৎপত্তি। যে শিক্ষা দ্বারা মানুষের মনে নীতিবোধ জন্মে, কিছু আচার ও নিয়ম-কানুন আয়ত্ত হয়, তাকে 'নৈতিক শিক্ষা' বলা হয়। 'নৈতিক শিক্ষা' ধর্মের অঙ্গ। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যানের মধ্যদিয়েও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সত্যবাদিতা, ক্ষমার ধারণা ও গুরুত্ব এবং তৎসম্পর্কিত দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্মীয় আদর্শের আলোকে সত্যবাদিতা ও ক্ষমার ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- সত্যবাদিতা ও ক্ষমার আদর্শের প্রমাণ সম্পর্কিত একটি উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- উপাখ্যানের শিক্ষা মূল্যায়ন করতে পারব
- পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সত্যবলা ও ক্ষমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- সত্য কথা বলার অভ্যাস ও ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ক্ষমার আদর্শ ও সত্যবলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সত্য বলার অভ্যাস গঠনে উদ্বুদ্ধ হব

পাঠ ১ ও ২ : সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতার ধারণা

সত্যবাদিতা একটি বিশেষ গুণ। এ গুণ যার থাকে, তিনি সমাজে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হন। সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। গোপন না করে অকপটে সবকিছু প্রকাশ করার নামই 'সত্যবাদিতা'। সত্য মানব জীবনের স্বরূপ বিকশিত করে। সত্যের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা বা তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সত্যবাদী কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। সত্যবাদিতা ধর্মের অঙ্গ। সকলেরই উচিত সত্যকথা বলা, সৎ পথে চলা এবং সত্যবাদিতার অনুশীলন করা। এ বিশ্বে যত মহাপুরুষ আছেন তাঁরা সকলেই সত্যবাদী। সত্য প্রকাশ করাই ছিল তাঁদের জীবনের অন্যতম ব্রত।

একক কাজ : কোন গুণদ্বারা তুমি সত্যবাদী লোককে চিহ্নিত করবে দৃষ্টান্তসহ লিখ।

সত্যবাদিতা সম্পর্কে উপনিষদ থেকে একটি উপাখ্যান বর্ণনা করছি ।

উপাখ্যান : সত্যবাদী সত্যকাম

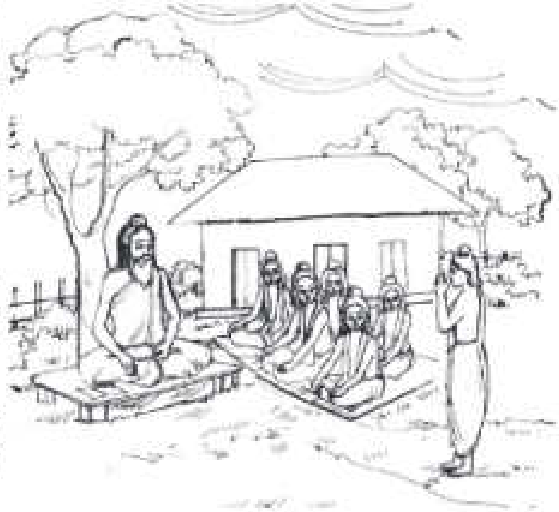

প্রাচীনকালে গৌতম নামে এক ঋষি ছিলেন । একদিন তিনি তাঁর আশ্রমে শিষ্যদের নিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন । এমন সময় একজন বালক এসে তাঁকে প্রণাম শেষে মাথা নিচু করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াল। ঋষি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?'

বালকটি উত্তর করল, 'আমার নাম সত্যকাম । এখান থেকে একটু দূরে গ্রামে আমার বাড়ি । সেখান থেকেই এসেছি ।'

ঋষি বললেন, 'এখানে কী চাও?' বালকটি বিনীতভাবে উত্তর দিল, 'গুরুদেব, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে চাই ।'

তখন ঋষি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গোত্র কী?' বালকটি করজোড়ে বলল, 'গুরুদেব, আমি আমার গোত্র কী তা জানিনা । বাড়িতে আমার মা আছেন । আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে কাল আপনাকে বলব ।' গৃহে এসে মাকে সব কথা খুলে বলল সত্যকাম । তার মা তাকে বললেন, 'বাবা সত্যকাম আমি তোমার গোত্র কী তা জানিনা । আমার নাম জবালা । তাই তুমি জাবাল সত্যকাম ।'

পরের দিন সত্যকাম ঋষির আশ্রমে গিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে বলল, 'গুরুদেব, আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । আমার গোত্র কী? কিন্তু মা বললেন যে তিনিও জানেন না আমার গোত্র কী। আমার মায়ের নাম জবালা । তাই আমি জাবাল সত্যকাম ।'

সত্যকামের মুখে এমন সরল সত্যকথা শুনে ঋষি তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন, 'বৎস, সত্যকাম, তুমি সত্যকথা বলেছ । সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণই এমন সত্য কথা বলতে পারে । আমি তোমাকে উপনয়ন দেব, ব্রহ্মবিদ্যা দান করব ।' গোত্রহীন হয়েও সত্যকাম সত্যকথা বলেছে বলে ঋষি তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে বুকে টেনে নিলেন । ব্রহ্মচর্য পালন করতে অনুমতি দিলেন । সেদিন থেকে সত্যকাম ঋষি গৌতমের আশ্রমে থেকে বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করল ।

উপাখ্যানের শিক্ষা

সত্য সর্বদা প্রকাশিত । সত্য প্রকাশ করা উচিত । সত্য কখনও গোপন করা যায় না ।

একক কাজ : সত্যবাদী সত্যকাম উপাখ্যানের শিক্ষা উল্লেখ কর এবং তোমার জীবনে এ শিক্ষার ক্ষেত্র চিহ্নিত কর ।

নতুন শব্দ : গোত্র, ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মবিদ্যা ।

পাঠ ৩ : পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সত্য কথা বলার গুরুত্ব

সত্য ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর করে। সত্যবাদীকে সকলে ভালোবাসে, বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। সত্যবাদী সকলেই আস্থার পাত্র। সত্যবাদীর সাহস সর্বদাই অধিক। এই সাহসের মূলে রয়েছে ব্যক্তির সৎ চিন্তা এবং পরিপূর্ণ বিবেকবোধ। আমাদের পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজের সকলকে সত্য বলার অভ্যাস গঠন করা উচিত।

পরিবারিক জীবনে সত্যকথা বলার প্রয়োজনীয়তা অধিক। সত্যকথা বলার মাধ্যমে পরিবারে পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসা সহজ হয়। পরিবারে একে অন্যকে সহজে বুঝতে পারে। পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ করা সহজ হয়। তাছাড়া পরিবারে একে অন্যের উপর নির্ভর করা যায়। সত্যকথা বলার মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। যেকোনো জটিলতা সহজে কাটিয়ে উঠা যায়। সুতরাং আমরা পরিবারের সকলে সত্য কথা বলব এবং সৎ জীবন গড়ব। সৎ জীবনই আমাদের পরিবারের মূলভিত্তি।

বিদ্যালয়ে আমরা নানা কার্যক্রমে জড়িত হই। এসব কার্যক্রমে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দায়িত্ব পালন করি। শিক্ষক, সহপাঠীসহ অন্যান্য সকলের সাথে বিভিন্ন কাজ করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের সত্যকথা বলার গুরুত্ব অধিক। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী সত্যবাদীকে খুব পছন্দ করে। সত্যবাদী সর্বদা স্পষ্টভাষী ও সৎসাহসী হয়ে থাকে। তাদের বিবেকবোধ অত্যন্ত সজাগ থাকে। এ গুণের কারণে সত্যবাদীকে সকলে পছন্দ এবং বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব প্রদান করে।

সমাজে সত্যবাদীকে সকলে বিশ্বাস করে। সত্যবাদী সমাজের আদর্শ। সমাজে সত্যবাদী ব্যক্তির আদর্শকে অনেকেই অনুসরণ করে। সমাজের বিভিন্ন বিরোধ, দ্বন্দ্বসহ নানা সমস্যা সমাধানে সত্যবাদী ব্যক্তিই এগিয়ে আসেন।

একক কাজ: পরিবার ও বিদ্যালয়ে সত্যকথা বলার গুরুত্বসমূহ চিহ্নিত কর।

পাঠ ৪ : সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা

সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা পরিবারের প্রধান। তাঁদেরকেই এ বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হয়। মা-বাবাকে পরিবারের সকল কাজকর্মে সত্যকথা বলার অভ্যাস করতে হবে। পরিবারে সত্যকথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি হলেই সন্তানের আচরণে তা প্রতিভাত হবে। সন্তান কোনো কাজে কোনো কারণে সত্য বলা হতে বিরত থাকলে মা-বাবা এ ক্ষেত্রে তার ভুল সংশোধনের সুযোগ দিয়ে সত্য বলতে উৎসাহিত করবেন। এ ক্ষেত্রে মা-বাবাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে এবং তাদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে।

পরিবারের বিভিন্ন কাজে মা-বাবা সন্তানের সাথে থাকেন। এ সময়ে সত্যবাদীর গল্প কিংবা ঘটনা বলে তাদের জীবনবোধে সাড়া জাগাতে পারেন। অনেক পরিবারে বাবা-মা এবং সন্তানরা একসাথে খাবার গ্রহণ করেন। এ সময়ে সত্যবলার পুরস্কার এর উপর কোনো ঘটনা বা এলাকার কোনো সত্য ঘটনার অবতারণা করে সন্তানের মনকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থে সত্যবলার অনেক কাহিনি রয়েছে। এসব গল্প বলার মাধ্যমেও পরিবারের সদস্যগণ শিশুদের সত্যকথা বলতে উৎসাহিত করতে পারেন।

একক কাজ: সত্য কথা বলার উৎসাহ প্রদানে তোমার পরিবারের সদস্যগণ কী ভূমিকা পালন করেছেন?

পাঠ ৫ : ক্ষমা

ক্ষমার ধারণা

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমা ধর্মের অঙ্গ। শাস্ত্রে আছে –

ধৃতি-ক্ষমা-দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, শুভবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ- এই দশটি ধর্মের স্বরূপ বা বাহ্য লক্ষণ। এখানে এই দশটি লক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় যে গুণ বা লক্ষণ- সেটি হলো ক্ষমা। আমরা জানি ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় ধার্মিকের মধ্যে। সুতরাং যিনি ধার্মিক তাঁর মধ্যে ক্ষমা নামক গুণটি থাকতেই হবে। অনুতপ্ত অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়াকে 'ক্ষমা' বলে। শাস্তি দেয়ার মতো শক্তি সাহস এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী বা অন্যায়কারীর উপর প্রতিশোধ না নিয়ে বা বল প্রয়োগ করে তাকে পরাভূত বা পর্যুদস্ত না করে ছেড়ে দেয়াকেই ক্ষমা করা বলে। 'ক্ষমা' দ্বারা অপরাধীর মনে অনুশোচনা হয়। এতে তার আত্মশুদ্ধির সুযোগ ঘটে। ভবিষ্যতে অন্যায়কারী বা অপরাধী পুনরায় অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ তার বিবেক এসব খারাপ কাজ করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করবে। 'ক্ষমা' দ্বারা শত্রুকে তার শত্রুতা থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব। আর এভাবেই সমাজ থেকে অশান্তি দূর হতে পারে। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা সকলেই এই 'ক্ষমা' গুণের অধিকারী ছিলেন। এই ক্ষমা গুণই তাঁদেরকে মহান বলে সকলের নিকট পরিচিত করিয়েছে। তাঁদের দ্বারাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা ক্ষমাশীল হব। তাহলে আমাদের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ শৃঙ্খলামণ্ডিত থাকবে।

একক কাজ : ধর্মের দশটি বাহ্যিক লক্ষণের নাম লেখ।

ক্ষমার আদর্শ বিষয়ক একটি উপাখ্যান–

উপাখ্যান : ক্ষমার আদর্শ

প্রায় পাঁচশত বছর আগের কথা। সে সময় জাতিভেদ, বর্ণভেদ সমাজকে কলুষিত করেছিল। সমাজের এই ভেদাভেদ দূর করে সমাজকে কলুষমুক্ত করতে, ধর্মীয় গোড়ামি ভেঙ্গে দিতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সহজ করে দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর সহচর ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আরও ছিলেন- শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীহরিদাস, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রী রঘুনাথদাস প্রমুখ।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁদের বললেন, কৃষ্ণনাম কর। জাতিধর্ম নির্বিশেষে হরিনাম বিলাও, শ্রী নিত্যানন্দ মেতে উঠলেন কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে। যাকে পান, তাকেই বলেন কৃষ্ণনামের কথা, ভজনের কথা।

সে সময় নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে

দুই ভাই বাস করত। তারা ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও সব সময় পাপ কাজে মত্ত ছিল। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মানুষের প্রতি অত্যাচার করাই ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজ। তাঁদের অত্যচারে নবদ্বীপের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। জগাই-মাধাইয়ের এমন দুরবস্থা দেখে নিত্যানন্দের প্রাণ কেঁদে উঠল। করুণায় তাঁর মন গলে গেল। তিনি সঙ্গী সাথীদের নিয়ে জগাই মাধাইয়ের বাড়ির কাছে গিয়ে কীর্তন শুরু করলেন-

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
তোমা সব লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সবে ছাড় অনাচার॥ *(চৈতন্য-ভাগবত)*

সারারাত মদ্যপান করে জগাই-মাধাই সে সময় দিবা নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কীর্তনের শব্দে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। জগাই-মাধাই বাইরে বেরিয়ে এলো। নিত্যানন্দের মুখে হরিনাম শুনে দুভাই ভীষণ ক্ষেপে গেল। তাদের অবস্থা দেখে নিত্যানন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। তাঁর দুচোখে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি 'হরিবোল', 'হরিবোল', বলে কেঁদে উঠলেন।

নিত্যানন্দের এহেন অবস্থা দেখে জগাই-মাধাইয়ের মন মোটেই নরম হলো না, বরং তারা ক্রোধে জ্বলে উঠল। মাধাই একটি কলসীর কানা নিয়ে নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করল। নিত্যানন্দের কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সে অবস্থাতেও তিনি হরিনাম করতে লাগলেন। যেন তাঁর কিছুই হয়নি। এমনিভাবে তিনি মাধাইকে বললেন-

'মারিলি কলসির কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥'

এ সংবাদ শোনামাত্র গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিষ্যগণসহ সেখানে উপস্থিত হলেন। নিত্যানন্দের ঐ রক্তাক্ত অবস্থা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে নিরস্ত করলেন। তিনি শান্ত হলেন।

এ ঘটনায় অনুতপ্ত হয়ে জগাই-মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে লুটিয়ে পড়ে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সহাস্যে বললেন জগাইকে আমি ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু মাধাই তো নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। আমার ভক্তকে যে কষ্ট দেয় আমি তাদের ক্ষমা করতে পারিনা।

তখন নিত্যানন্দ গদগদ কণ্ঠে মহাপ্রভুকে বললেন, 'আমি জানি তুমি এ দুটি জীবকে উদ্ধার করবে। তবু আমার গৌরব বাড়ানোর জন্যই আমার অনুমতির কথা বলছ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি মাধাইকে ক্ষমা করলাম।' এই বলে নিত্যানন্দ মাধাইকে আলিঙ্গন করলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন জগাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। ভক্তগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হরিবোল', 'হরিবোল'।

এ ঘটনার পর জগাই-মাধাই হয়ে গেল নতুন মানুষ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলতে তাদের নয়নে অশ্রু ঝরে। এভাবে বড় সাধক হয়ে গেল জগাই মাধাই। শ্রীনিত্যানন্দের ক্ষমাই মহাপাপী জগাই মাধাইকে সাধকে পরিণত করেছিল। এটাই ক্ষমার আদর্শ।

একক কাজ : শ্রীনিত্যানন্দের আদর্শ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উপাখ্যানের শিক্ষা: ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। ক্ষমা দ্বারা অসৎ মানুষকে সৎ মানুষে পরিবর্তন করা এবং দুর্জয় শত্রুকেও বশ করা যায়।

পাঠ ৬ : পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে ক্ষমার গুরুত্ব

ক্ষমা মহৎ গুণ। ক্ষমাশীল ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে সমাদৃত। শিশু ক্ষমার শিক্ষা পরিবারের মধ্য হতেই অর্জন করে থাকে। আমাদের পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন কাজে ক্ষমার গুরুত্ব অনেক। ক্ষমা মানুষকে মহৎ করে তোলে। পরিবারে ক্ষমার দৃষ্টান্ত পরস্পরের মধ্যে মানসিক দূরত্ব কমিয়ে দেয়। পারিবারিক জীবনে অনেক সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে কেউ অন্যায় করে আবার কেউবা তা সহ্য করে। এ সহ্যবোধের মধ্য দিয়ে কেউ অন্যের রূঢ় আচরণে ক্ষুব্ধ না হয়ে ক্ষমা করে দেয়। ক্ষমা করার এই গুণ পরিবারের অন্য সদস্যকেও প্রভাবিত করে। ক্ষমাবোধ আমাদের আচরণকে পরিশীলিত করে। ক্ষমাশীল সদস্যের প্রতি পরিবারের সকলের শ্রদ্ধাবোধ অধিক থাকে। আমাদের বিদ্যালয় পরিবেশেও ক্ষমার গুরুত্ব অধিক। বিদ্যালয়ে আমাদের বন্ধুদের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই নানা বিষয় নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রেও কেউ অন্যায় করে আবার কেউবা অন্যায় না করে বন্ধুর অন্যায় আচরণ সহ্য করে। কেউ বন্ধুর অন্যায় আচরণ শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং বন্ধুকে ক্ষমা করে দেয়। এতে বন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। ক্ষমা শিক্ষার্থীর জীবন সুন্দর করে তোলে। আমাদের অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা ক্ষমাশীল। তাঁদের এই ক্ষমাশীল আচরণ দ্বারা আমরা নানাভাবে প্রভাবিত হই। ক্ষমার গুণ বিদ্যালয় পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারে। সমাজ জীবনেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমার গুরুত্ব অধিক। ক্ষমাশীল ব্যক্তি সমাজে সমাদৃত এবং শ্রদ্ধার পাত্র।

একক কাজ: পারিবারিক জীবনে ক্ষমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৭ : ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা

ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিবারে মা-বাবা ক্ষমাশীল আচরণ করে সে পরিবারে সন্তানের মধ্যেও এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হবে। পরিবারে সকল সদস্য একই প্রকৃতির আচরণ করে না। একই পরিবারের সদস্যদের আচরণের ধরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ একটু সহজ ও সরল প্রকৃতির আবার কেউবা জটিল প্রকৃতির। কোনো কারণে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে পরিবারে একেক জনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ধরনও একেক প্রকৃতির। এ ক্ষেত্রে মা-বাবাকে অত্যন্ত সচেতন হতে হয়। পরিবারে যারা সর্বদাই অন্যায় ও রূঢ় আচরণ করে তাদের প্রতি মা-বাবাকে ধৈর্য ও সহনশীল হতে হয়। ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য অন্যায়কারীর নিকট তুলে ধরতে হয়। তাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে ছোট ছোট অন্যায়গুলো ক্ষমা করে দিতে হয়। জীবনে অন্যায় আচরণের প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের নিকট বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হয়। সমাজ জীবনে যারা ক্ষমাশীল হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র তাদের জীবনের ঘটনা সন্তানদের মাঝে গল্পের ছলে বলতে হয়। পরিবারে আমরা যখন একই সাথে কোনো কাজ করি কিংবা খাবার খেতে বসি এ সময়ে বাবা কিংবা মা ধর্মগ্রন্থের ক্ষমার আদর্শের কাহিনি শুনিয়েও আমাদের বিবেকবোধে নাড়া দিতে পারেন।

একক কাজ: তোমার পরিবারে ক্ষমার আদর্শ গঠনে মা কিংবা বাবা কী ভূমিকা রাখতে পারেন তা বুঝিয়ে লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. সত্যবাদিতা...... চরিত্রের একটি মহৎ গুণ।

২. প্রাচীনকালে গৌতম নামে এক............... ছিলেন।

৩. ক্ষমা দ্বারা অপরাধীর মনে............... হয়।

৪. শ্রীগৌর সুন্দরই............... মহাপ্রভু।

৫. নিত্যানন্দ............... আলিঙ্গন করলেন।

২. ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বামপাশের সাথে মিল কর:

বামপাশ	ডানপাশ
১. অনুতপ্ত অপরাধীকে শাস্তি	প্রকাশিত
২. মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য	তারা অধৈর্য হতে পারে
৩. শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন	না দিয়ে ছেড়ে দেয়া কে ক্ষমা বলে
৪. সত্য সর্বদা	নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ
৫. ভক্তগণ সমস্বরে বলে উঠলেন	'কৃষ্ণ নাম কর'
	'হরিবোল'! 'হরিবোল'

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সত্যকামের মায়ের নাম কী?

ক. সুমিত্রা খ. রাজকুমারী

গ. চন্দ্রমণি ঘ. জবালা

২. সত্যবাদিতা বলতে বোঝায় -

i. সদাচরণ করা

ii. কোন কিছু গোপন করা

iii. অকপটে সবকথা খুলে বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রাপ্তি অবসর পেলেই ফুল বাগানে গিয়ে গাছের পরিচর্যা করে। কিন্তু সে লক্ষ্য করল, কে যেন তার গাছের ফুল ছিঁড়ে ফেলে রাখে। একদিন সে বারান্দায় বসে আছে। এমন সময় এক ছোট্ট বালক এসে তার বাগানের সামনে দাঁড়াল। দেখা মাত্রই প্রাপ্তি তাকে ধমকের স্বরে বলল, তুমি আমার গাছের ফুল ছিঁড়ো? উত্তরে সে নির্ভয়ে সরলভাবে বলল, হ্যাঁ, আমি প্রতিদিন তোমার গাছের ফুল ছিঁড়ি। ছোট্ট বালকের মুখে এমন কথা শুনে প্রাপ্তি বিস্মিত হয়ে যায়।

১০৩৫

৩. ছোট্ট বালকের আচরণের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. সত্যবাদিতা খ. ক্ষমা

গ. জীবসেবা ঘ. কর্তব্য নিষ্ঠা

৪. ছোট্ট বালকের আচরণের সাথে তোমার পঠিত উপাখ্যানের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. আরুণির খ. সত্যকামের

গ. ধ্রুবের ঘ. প্রহলাদের

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নৈতিক শিক্ষা বলতে কী বোঝ?

২. সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর ।

৩. ধর্মের বাহ্য লক্ষণগুলো লেখ ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সত্যবাদিতা সম্পর্কিত উপাখ্যানের শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।

২. ক্ষমার আদর্শ স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের মহত্ত্বের পরিচয় দাও ।

৩. ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর ।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সুরেশ তার প্রতিবেশী দ্বিজেন বাবুর জমি দখল করে নেয় । ফলে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল । কিন্তু এক পর্যায়ে সুরেশ জটিল রোগে আক্রান্ত হলে দ্বিজেন বাবু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন । এ ঘটনায় সুরেশের মনে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয় এবং সে দ্বিজেন বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে । দ্বিজেন বাবু সুরেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করে দেন ।

ক. ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি?

খ. অপরাধীকে ক্ষমা করা হয় কেন ব্যাখ্যা কর ।

গ. দ্বিজেন বাবুর ক্ষমার মধ্যে তোমার পঠিত উপাখ্যানের কার নৈতিক আদর্শ ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. 'সুরেশের অনুশোচনা যেন মাধাইয়ের অনুশোচনার অনুরূপ'- তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও ।

সপ্তম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

ভারতবর্ষে অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন। আজীবন তাঁরা জগতের কল্যাণ করেছেন। মানুষের মঙ্গল করেছেন। তাঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। তাই তাঁদের জীবনী আমাদের কাছে আদর্শ জীবনচরিত হিসেবে বিবেচ্য। এ অধ্যায়ে পাঁচজন আদর্শ মহাপুরুষ এবং মহীয়সী নারীর জীবনচরিত বর্ণনা করা হলো। তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, রাণী রাসমণি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বামাক্ষেপা।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালের জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনাদর্শের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- রাণী রাসমণির জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানতে পারব
- রাণী রাসমণির সংস্কারমূলক কার্য বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে বামাক্ষেপার জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনাদর্শের শিক্ষা নিজ জীবনাচরণে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হব
- পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত মহাপুরুষ-মহীয়সী নারীদের জীবনী ও অবদান সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারব।

পাঠ ১ : শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান– 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' । জগতের কল্যাণের জন্য তিনি মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুষ্টকে দমন করে তিনি শিষ্টকে পালন করেছিলেন। আমরা এখানে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানব।

তখন দ্বাপর যুগ। মথুরায় রাজত্ব করতেন রাজা কংস। তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেন।

কংসের খুড়তুত বোন দেবকী। পরমা সুন্দরী। দেবকীকে কংস খুব ভালোবাসেন। তাই আদর করে রাজা শূরের পুত্র বসুদেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। বসুদেব ছিলেন পরম ধার্মিক ও রূপবান। বসুদেবের সঙ্গে বোনের বিয়ে হওয়ায় কংস খুব খুশি। নিজে রথ চালিয়ে তিনি তাঁদের রাজ্যে পৌঁছে দিচ্ছিলেন। এমন সময় দৈববাণী হলো– 'শোন কংস, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমায় হত্যা করবে।'

এ-কথা শুনে কংস ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তিনি তরবারি দিয়ে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন বসুদেব মিনতি করে বললেন, 'আপনি ওকে হত্যা করবেন না। আমরা আমাদের প্রতিটি সন্তানকে জন্মমাত্র আপনার হাতে তুলে দেব।'

বসুদেবের কথায় কংস শান্ত হলেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আটকে রাখলেন। একে একে তাঁদের ছয়টি পুত্র সন্তান হলো। বসুদেব তাদেরকে কংসের হাতে তুলে দিলেন। কংস তাদের পাথরে আছড়ে হত্যা করলেন।

দেবকীর সপ্তম সন্তান বলরাম। ভগবান তাঁকে দেবকীর গর্ভ থেকে বসুদেবের প্রথম স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে নিয়ে যান। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম। সেদিন প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। বসুদেব তাকিয়ে দেখলেন কারাকক্ষের দরজা খোলা। কারারক্ষীরা সব ঘুমে অচেতন। কোথাও কেউ জেগে নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঐ অবস্থায়ই বসুদেব শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে, নদী পার হয়ে, গোকুলে চলে গেলেন। সেখানেও সবাই ঘুমে অচেতন। তিনি নন্দরাজার বাড়িতে ঢুকলেন। তাঁর স্ত্রী যশোদার পাশে কেবল জন্ম নেয়া একটি মেয়ে শিশু ঘুমাচ্ছে। বসুদেব মেয়েটিকে কোলে নিয়ে নিজের পুত্রকে সেখানে রাখলেন। তারপর দ্রুত চলে এলেন কংসের কারাগারে। মেয়েটিকে শুইয়ে দিলেন দেবকীর পাশে।

কারাগারের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। কারারক্ষীরা জেগে উঠলেন। পরের দিন প্রভাতে সবাই দেখল, দেবকীর এক মেয়ে হয়েছে। কংস এসে যখন মেয়েটিকে আছড়ে মারতে গেলেন, তখন সে হঠাৎ আকাশে উঠে গেল এবং কংসকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।'

এ-কথা শুনে কংস ভয়ে চমকে উঠলেন। ক্রোধে ক্ষিপ্তও হলেন। তিনি তক্ষুনি আদেশ দিলেন গোকুলে যত শিশু আছে সবাইকে মেরে ফেলতে।

কংসের আদেশে পূতনা রাক্ষসীকে ডাকা হলো এবং তাকে বলা হলো গোকুলের সমস্ত শিশুকে মেরে ফেলতে হবে। বিনিময়ে তাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে।

স্বর্ণমুদ্রার লোভে পূতনা এক সুন্দরী নারীর রূপ ধরে গোকুলে চলল। প্রথমেই গেল নন্দরাজের বাড়ি। কেঁদে কেঁদে যশোদাকে বলল, 'মা, আমি বড়ই দুঃখিনী। আমার দুধের শিশু মারা গেছে। আমার কোনো টাকা-পয়সা চাইনে। দুবেলা দুটো খেতে দিও। বিনিময়ে আমি তোমার শিশুপুত্রকে পালন করব।'

পূতনার কথায় যশোদার মায়া হলো। তিনি পূতনাকে কাজে রাখলেন। একদিন পূতনা কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বাইরে গেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। তখন নিজের স্তন কৃষ্ণের মুখে ঢুকিয়ে দিল। স্তনে মাখানো ছিল তীব্র বিষ। তার ধারণা ছিল, এই বিষে কৃষ্ণের মৃত্যু হবে। কিন্তু কৃষ্ণ তো ভগবান। শিশু হলেও তিনি সবই বুঝতে পারলেন। তাই পূতনার স্তনে এমন টান দিলেন যে, তাতে পূতনারই মৃত্যু হলো। এভাবে পূতনাকে বিনাশ করে তিনি গোকুলের শত শত শিশুকে বাঁচালেন।

পূতনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কংস খুবই চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবলেন, কোনো নারীর পক্ষে কৃষ্ণকে মারা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর এক শক্তিশালী পুরুষ অনুচরকে ডাকলেন। তাকে সব বুঝিয়ে বললেন। অনুচর বলল, 'মহারাজ, চিন্তা করবেন না। আজ সূর্যাস্তের মধ্যেই আপনি শত্রুর মৃত্যু সংবাদ পাবেন।' এই বলে অনুচর গোকুলের দিকে চলল। সোজা গিয়ে উঠল নন্দরাজের বাড়িতে। মা যশোদা তখন একটা শকট বা গাড়ির নিচে কৃষ্ণকে শুইয়ে রেখে কাজ করছিলেন। এই সুযোগে অনুচর শকট চাপা দিয়ে কৃষ্ণকে মারতে এগিয়ে গেল। কৃষ্ণ তার মনোভাব বুঝতে পারলেন। তাই সজোরে এক লাথি মারলেন। ফলে শকটের চাপে অনুচর মারা গেল। এভাবে কৃষ্ণ কংসের অনুচরের হাত থেকেও গোকুলের শিশুদের রক্ষা করলেন।

এবার কংস তৃণাবর্ত নামক এক অসুরকে পাঠালেন কৃষ্ণকে মারার জন্য। তৃণাবর্ত গোকুলে গিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করল। সমস্ত গোকুল ভীষণ ঝড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। তৃণাবর্তের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে অনেক উঁচুতে তুলে আছড়ে মারবে। ঘূর্ণিবায়ুর ফলে কৃষ্ণ অনেক উঁচুতে উঠে এলেন বটে। কিন্তু তাঁকে আছাড়

মারার আগে তিনিই তৃণাবর্তের বুকে দিলেন ভীষণ চাপ। ফলে মাটিতে পড়ে সে মারা গেল। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ শৈশব অবস্থায়ই দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, ভগবান সর্বদা দুষ্টের দমন করেন এবং শিষ্টের পালন করেন। মানবরূপে জন্ম নিয়ে তিনি দুর্জনদের হত্যা করে জগতের মঙ্গল করেন। ভগবান সহায় থাকলে দুষ্টরা কিছু করতে পারেনা। তিনিই সবাইকে রক্ষা করেন। তাই আমরা সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করব। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণে সাহসী ভূমিকা নিয়ে শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে যাব।

একক কাজ : শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালের একটি ঘটনা লেখ।

নতুন শব্দ : স্বয়ম্, শিষ্ট, দৈববাণী, ঘুটঘুটে, কারাগার, কারারক্ষী, ক্ষিপ্ত, পূতনা, শকট, ঘূর্ণিবায়ু।

পাঠ ২ : শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা। এর অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার একটি গ্রাম চাকলা। এ গ্রামেই ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে লোকনাথের জন্ম। পিতা রামকানাই চক্রবর্তী এবং মাতা কমলা দেবী।

লোকনাথ ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার চতুর্থ পুত্র। রামকানাইর বড়ই ইচ্ছা– তাঁর একটি পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করুক। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে বংশ পবিত্র করুক।

পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য লোকনাথ এগিয়ে এলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। এ-কথা শুনলেন লোকনাথের বন্ধু বেণীমাধব চক্রবর্তী। তিনিও সিদ্ধান্ত নিলেন সন্ন্যাস নেবেন। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী হলেন তাঁদের গুরু। তিনি ছিলেন একজন যোগী পুরুষ। তিনি তাঁদের দীক্ষা দিলেন। তারপর একদিন দুই বালক ব্রহ্মচারীকে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

প্রথমে তাঁরা গেলেন কোলকাতার কালীঘাটে। কালীঘাট তখন সাধন-ভজনের এক পবিত্র অরণ্যভূমি। গুরুর তত্ত্বাবধানে লোকনাথ ও বেণীমাধব কঠোর সাধনায় রত হলেন। এভাবে তাঁদের ২৫ বছর কেটে গেল। তারপর তাঁরা গেলেন কাশীধামে। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী তখন বৃদ্ধ। শরীর খুবই দুর্বল। তাই তিনি কাশীধামের পরম সাধক হিতলাল মিশ্রের হাতে লোকনাথ ও বেণীমাধবকে তুলে দিলেন। তারপর গঙ্গার ঘাটে গিয়ে তিনি যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

হিতলাল মিশ্র লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নিয়ে চলে যান হিমালয়ে। সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করে দুজনেই সিদ্ধিলাভ করেন। যোগবিভূতির অধিকারী হন। এরপর তাঁরা দেশ পরিভ্রমণে বের হন। আফগানিস্তান,

মক্কা, মদিনা, চীন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে তাঁরা হিমালয়ে ফিরে আসেন। হিতলাল তখন বলেন, 'আমার সাথে আর তোমাদের থাকার প্রয়োজন নেই। তোমরা নিজভূমিতে যাও। সেখানে তোমাদের কাজ করতে হবে।'

এবার দুই বন্ধুর বিচ্ছিন্ন হবার পালা। বেণীমাধব গেলেন ভারতের কামাখ্যার দিকে। আর লোকনাথ এলেন কুমিল্লার দাউদকান্দিতে। এখান থেকেই লোকনাথের লোকসেবা ও সাধনার নতুন জীবনের শুরু।

দাউদকান্দিতে লোকনাথ একদিন এক বটগাছের নিচে বসে ধ্যান করছেন। এমন সময় ভেঙ্গু কর্মকার নামে এক দরিদ্র লোক এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'বাবা, আমাকে রক্ষা করুন। আমি এক ফৌজদারি মামলায় পড়েছি। রেহাই পাবার উপায় নেই।'

ভেঙ্গুকে দেখে লোকনাথের দয়া হলো। তিনি যে সর্বজীবের মধ্যেই ব্রহ্মকে খুঁজতেন। সর্বজীবের মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর সাধনার লক্ষ্য। তাই তিনি ভেঙ্গুকে অভয় দিয়ে বললেন, 'যা, তুই মুক্তি পাবি।' ভেঙ্গু ঠিকই মুক্তি পেলেন। তাই খুশি হয়ে তিনি লোকনাথকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। লোকনাথ সেখানে কিছুদিন থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদী গ্রামে চলে গেলেন।

বারদীর জমিদার তখন নাগবাবু। তিনি একবার লোকনাথের কৃপায় মামলায় জয়লাভ করেন। তাই তিনি বারদী গ্রামে লোকনাথের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। ক্রমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় লোকনাথের আশ্রম। দলে-দলে ভক্তরা আসতে থাকেন। লোকনাথের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অনেক রুগ্ণ মানুষ সুস্থ হন। অনেকে বিপদ থেকে উদ্ধার পান। পাপী- তাপী মুক্তি লাভ করেন। সাধকেরা সিদ্ধি লাভ করেন। এভাবে লোকনাথ 'বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

লোকনাথ জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বিচার করতেন না। তাঁর কাছে সব মানুষই ছিল সমান। তাঁকে এক গোয়ালিনী দুধ দিতেন। লোকনাথ তাঁকে মা বলে ডাকতেন। লোকনাথের অনুরোধে গোয়ালিনী শেষে আশ্রমেই থাকতেন।

লোকনাথ শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু ও পশুপাখিকেও সমানভাবে ভালোবাসতেন । তাঁর আশ্রমে অনেক পশুপাখি থাকত । তিনি নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন । পাখিরা নির্ভয়ে তাঁর গায়ে এসে বসত । আসলে তিনি সব জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের উপস্থিতি উপলব্ধি করতেন । তিনি মনে করতেন, ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কল্যাণতম রূপে । তিনি বলতেন, 'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি ।'– আমি তোমার কল্যাণতম রূপই প্রত্যক্ষ করি । তাই জীবের কল্যাণ করে তিনি যে আনন্দ পেতেন, সেটাই ছিল তাঁর ব্রহ্মানন্দ ।

বাবা লোকনাথ ছিলেন অশেষ কৃপাবান মহাপুরুষ । তাই তিনি সংসারী লোকদের প্রতি পরম আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

'রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে,
আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব ।'

এই পরম পুরুষ বাবা লোকনাথ ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে বারদীর আশ্রমে পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৬০ বছর ।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে । মানুষ, পশু-পাখি সকল জীবকে ভালোবাসতে হবে । জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনরূপ ভেদাভেদ করা যাবে না । সমাজের উঁচু-নীচু সবাইকে সমান মর্যাদা দিতে হবে । ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে । সকলের মধ্যে যে আত্মা আছে, তার সঙ্গে নিজের আত্মাকে এক করে দেখতে হবে । তবেই ব্রহ্মলাভ হবে ।

একক কাজ : শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর লোকসেবার একটি ঘটনা লিখ ।

নতুন শব্দ : ব্রহ্মচারী, যোগীপুরুষ, ফৌজদারি, পশ্যামি, ব্রহ্মজ্ঞান ।

পাঠ ৩ : রাণী রাসমণি

রাণী রাসমণি ছিলেন এক মহীয়সী নারী । গরিবের ঘরে জন্ম হলেও এক জমিদারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় । ফলে তিনি সত্য সত্যিই রানির পদে অধিষ্ঠিত হন । কিন্তু রানি হলে কী হবে? তিনি কখনও বিলাসী জীবন যাপন করেননি। আজীবন ধর্মচর্চা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন । এজন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রাণী রাসমণি কোলকাতার উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে হালিশহরের নিকট কোনা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। হরেকৃষ্ণ দাসের পেশা ছিল গৃহ-নির্মাণ ও কৃষিকাজ। জন্মের পর মা রামপ্রিয়া মেয়ের নাম রাখেন রাণী। পরে তাঁর নাম হয় রাসমণি। আরও পরে দুটি নাম একত্রিত হয়ে প্রতিবেশীদের কাছে তিনি রাণী রাসমণি নামে পরিচিত হন। ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের চার কন্যা– পদ্মামণি, কুমারী, করুণা এবং জগদম্বা।

রাজচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত কর্মকুশল। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিমতী স্ত্রী রাসমণি। কিন্তু ব্যবহারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। এর ফলে তাঁর সাফল্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর রাজচন্দ্র বিশাল সম্পদের অধিকারী হন।

রাজচন্দ্র নিজে ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্ত্রী রাসমণির অনুপ্রেরণা। ফলে এই জমিদার পরিবার জনকল্যাণের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। ১২৩০ (১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালের বন্যায় বাংলার অনেক পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। রাণী রাসমণি তাদের সাহায্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। ঐ বছরই রাসমণির পিতা পরলোক গমন করেন। রাসমণি কন্যার কর্তব্য অনুসারে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া করার জন্য গঙ্গার ঘাটে যান।

কিন্তু যাতায়াতের রাস্তা এবং গঙ্গার ঘাটের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাই জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে রাণী স্বামীকে অনুরোধ করেন সংস্কারের জন্য। রাজচন্দ্র বহু টাকা খরচ করে 'বাবু ঘাট' ও 'বাবু রোড' নির্মাণ করান।

রাজচন্দ্র ও রাসমণির দাম্পত্য জীবন খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে রাজচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। এর ফলে জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব পড়ে রাণী রাসমণির ওপর। কিন্তু জমিদারির পাশাপাশি তিনি জনকল্যাণ ও ধর্মচর্চা সমানভাবে করে গেছেন।

১২৪৫ (১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে রাণী রাসমণি ১,২২,১১৫ টাকা খরচ করে একটি রূপার রথ তৈরি করান। তাতে জগন্নাথ দেবকে বসিয়ে রথযাত্রার দিন পরিবারের লোকজনকে নিয়ে কোলকাতার রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করেন।

একবার তিনি পুণ্যভূমি জগন্নাথ ক্ষেত্রে যান। সেখানকার রাস্তাঘাট ছিল জরাজীর্ণ। তীর্থযাত্রীদের খুব কষ্ট হতো চলাফেরা করতে। রাসমণি তাঁদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সমস্ত রাস্তা সংস্কার করে দেন।

শুধু তা-ই নয়। ষাট হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহের জন্য হীরক খচিত তিনটি মুকুটও তৈরি করিয়ে দেন।

রাণী রাসমণি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো গঙ্গার জলকর বন্ধ করা। একবার ইংরেজ সরকার গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য জেলেদের ওপর কর আরোপ করেন। নিরুপায় জেলেরা তখন রাসমণির শরণাপন্ন হন। রাসমণি সরকারকে দশ হাজার টাকা কর দিয়ে মুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা জমা নেন এবং রশি টানিয়ে জাহাজ ও নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে সরকার আপত্তি তোলেন। উত্তরে রাণী বলেন যে, নদীতে জাহাজ চলাচল করলে মাছ অন্যত্র চলে যাবে। এতে জেলেদের ক্ষতি হবে। এ অবস্থায় সরকার রাণীকে তাঁর টাকা ফেরত দেন এবং জলকর তুলে নেন।

রাণী তাঁর প্রজাদের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করতেন। একবার এক নীলকর সাহেব মকিমপুর পরগণায় প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন শুরু করেন। এ-কথা রাণী শুনতে পান এবং তাঁর হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা খরচ করে 'টোনার খাল' খনন করান। এর ফলে মধুমতী নদীর সঙ্গে নবগঙ্গার সংযোগ সাধিত হয়। এছাড়া সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাট নির্মাণ তাঁর অনন্য কীর্তি।

ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে রাণী রাসমণির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন। রাণী একদিন বিশ্বেশ্বর দর্শনের জন্য কাশীধামে যাওয়া স্থির করেন। যাত্রার পূর্বরাত্রে মা কালী তাঁকে স্বপ্নে বলেন, 'কাশী যাওয়ার আবশ্যকতা নেই, গঙ্গার তীরে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করো। আমি ঐ মূর্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয়ে তোমার নিকট থেকে নিত্য পূজা গ্রহণ করব।' মায়ের এই আদেশ পেয়ে রাসমণি গঙ্গার তীরে জমি কিনে মন্দির নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অগ্রজ রামকুমারকে পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। রাণী সেখানে প্রতিদিন পূজা দিতেন। রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ স্বয়ং পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কারণেই ঐ মন্দির আজ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির নামে খ্যাত। এখানেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাণী রাসমণি ইহধাম ত্যাগ করেন।

রাণী রাসমণির জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা লাভ করতে পারি যে, মানুষের জন্মের চেয়ে তার কর্মই বড়। জন্ম যেখানেই হোক, কর্মের দ্বারা মানুষ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। এটাই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সম্পদকে মানুষের সেবায় লাগাতে হবে। শুধু নিজের সুখই নয়, অপরের সুখের জন্যও সম্পদ ও ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে। কর্মের অবসরে ধর্মচর্চায় মন দিতে হবে। তাতে দেহ-মন শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়। এভাবে ধর্মচর্চা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারলে জীবন সার্থক হয়।

দলীয় কাজ : রাণী রাসমণির সংস্কারমূলক কাজ চিহ্নিত করে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : মহীয়সী, জগদম্বা, অমায়িক, খচিত, জলকর, দেবোত্তর, দানপত্র ।

পাঠ ৪ : শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি । তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণি দেবী । ক্ষুদিরাম শিশুপুত্রের নাম রাখেন গদাধর । এই গদাধরই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসে নামে জগদ্বিখ্যাত হন ।

বালক গদাধর দেখতে ছিলেন খুবই সুন্দর । সদা প্রসন্ন ভাব তাঁর । প্রকৃতিকে খুবই ভালোবাসতেন । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত । আকাশে উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক দেখে মাঝে মাঝে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন । বাঁধাধরা লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিলনা । কিন্তু ভজন-কীর্তনের প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল । লোকমুখে শুনে শুনে তিনি বহু স্তব-স্তোত্র এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন ।

পিতার মৃত্যুর পর গদাধরের জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে । তিনি কখনও শ্মশানে গিয়ে বসে থাকেন । কখনও বা নির্জনে আম বাগানে গিয়ে সময় কটান । সাধু-বৈষ্ণবদের দেখলে কৌতূহল ভরে তাঁদের আচরণ লক্ষ করেন । তাঁদের নিকট ভজন শেখেন ।

এক সময় গদাধর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে আসেন । তাঁর বড় ভাই রামকুমার মন্দিরের পুরোহিত । গদাধর কখনও কখনও মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ময় হয়ে থাকেন । কখনও আবার আত্মমগ্ন অবস্থায় গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ান ।

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর মায়ের পূজার ভার গ্রহণ করেন । এখানেই তাঁর সাধন জীবনের শুরু । তিনি ভবতারিণীর পূজায় মন-প্রাণ ঢেলে দেন । মাকে শোনান রামপ্রসাদী আর কমলাকান্তের গান । 'মা', 'মা' বলে আকুল হয়ে যান । তাঁর আকুল আহ্বানে একদিন মা ভবতারিণী জ্যোতির্ময়ী রূপে আবির্ভূত হন ।

এ-সময় গদাধরের জীবনে ঘটে আর এক পরিবর্তন । ভাবের আবেশে তিনি উন্মাদের ন্যায় আচরণ করেন । ক্রমে ক্রমে তাঁর উন্মাদনা বেড়ে যায় । এ খবর পেয়ে মা চন্দ্রমণি তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান এবং রাম মুখুজ্যের মেয়ে সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন ।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন । আবার তাঁর মধ্যে দিব্যোন্মাদনার ভাব দেখা দেয় । এ-সময় অর্থাৎ ১৮৬১ সালের শেষভাগে সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন । গদাধর তাঁকে গুরু মানেন এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । এই ভৈরবীই গদাধরকে অসামান্য যোগী এবং অবতার পুরুষ বলে আখ্যায়িত করেন ।

এরপর গদাধরের সাধন জীবনে আসেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করে তিনি গদাধরের নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধনপথ শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি মতে সাধনা করেন। এমনকি ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মমতেও সাধনা করেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি বলেন, 'নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।' তাঁর উপলব্ধ সত্য হলো, **'যত মত তত পথ'**। অর্থাৎ পথ বহু হলেও লক্ষ্য এক – ঈশ্বর লাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা ও তাঁর পরমতসহিষ্ণুতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে অনেক জ্ঞানী-গুণী দক্ষিণেশ্বরে আসতে লাগলেন। তিনি তাঁদের গল্পের মাধ্যমে অনেক জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন।

প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণরাও আসতে লাগলেন। একদিন এলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ঈশ্বর দেখেছেন এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখেছি। এই তোকে যেমন দেখছি। তোকেও দেখাতে পারি।' নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ঈশ্বর দর্শন করে ধন্য হলেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করলেন। এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু মুখের কথা নয়, সেগুলো তাঁর জীবনচর্চায় রূপায়িত সত্য। তিনি অহংকারশূন্য হয়ে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করেছেন। জীবসেবার আদর্শে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট এই মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ :

১. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে প্রীতি কর। জগৎরূপে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা। জননী, জন্মস্থান, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ধর্ম ছাই হয়ে যাবে।

২. মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা। যতক্ষণ মা আছেন, মাকে দেখতে হবে।

৩. একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। ভক্তের জাতি নেই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়।

৪. ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়।

৫. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়। **'যত মত তত পথ'**।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। পিতা, মাতা এবং জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। তাহলে আর ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেবে না। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক– ঈশ্বর লাভ। সকল ধর্মে

ভক্তি থাকলে জাতিভেদ থাকবে না। ভক্তের কোনো জাতি নেই। ভক্তিতে দেহ, মন, আত্মা শুদ্ধ হয়। আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই জীবনাদর্শ অনুসরণ করব।

একক কাজ : শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ তুমি কীভাবে মেনে চলবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : পরমহংস, আবেশ, মুগ্ধ, দিব্যোন্মাদনা, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, সিদ্ধিলাভ, শ্রীপাদপদ্ম, ব্রহ্মময়ী, সংঘাত।

পাঠ ৫ : বামাক্ষেপা

বামাক্ষেপা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সাধক। তিনি তান্ত্রিক মতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সাধনার স্থল ছিল তারাপীঠ। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় তারাপীঠ অবস্থিত। এখানে আরও অনেক তন্ত্রসাধক সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। যেমন– আনন্দনাথ, কৈলাসপতি প্রমুখ। তারাপীঠ হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান।

তারাপীঠের নিকটে অটলা গ্রাম। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শিব চতুর্দশী তিথিতে বামাক্ষেপা এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাতা রাজকুমারী দেবী। বামাক্ষেপা তাঁর পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান।

প্রথম সন্তান জয়কালী। এছাড়া দুর্গাদেবী, দ্রবময়ী ও সুন্দরী নামে তাঁর আরও তিন বোন এবং রামচন্দ্র নামে এক ভাই ছিলেন।

বামাক্ষেপার আসল নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পরে তারামায়ের সাধনায় তাঁর ক্ষেপামি বা একরোখা ভাব দেখে সবাই তাঁকে বামাক্ষেপা বলেই ডাকতেন।

পিতা সর্বানন্দ খেত-খামারে কাজ করতেন। এতে যে সামান্য আয় হতো, তাতেই তাঁর সংসার কোনো রকমে চলে যেত।

সর্বানন্দ ছিলেন বড়ই ধর্মভীরু ও সরল প্রকৃতির মানুষ। অল্প বয়সে দীক্ষা নিয়ে তিনি তারামায়ের সাধনায় ডুবে যান। স্ত্রী রাজকুমারীও ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও ভক্তিমতী। এমন বাবা-মায়ের সন্তান হয়ে বামাচরণও তারামায়ের ভক্ত হন। 'জয়তারা জয়তারা' বলে তিনি মাটিতে লুটোপুটি খান। বামাচরণ বড়ই সরল ও আপনভোলা। তাঁর সরলতা অন্যের চোখে ছিল পাগলামি।

প্রথাগত লেখাপড়ার প্রতি বামাচরণের মন ছিলনা। পাঠশালা কোনোরকমে শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে আর যাওয়া হয়নি। তবে তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি সুমিষ্ট স্বরে গান গাইতে পারতেন। একদিন তারামায়ের মন্দিরে গানের আসর বসেছে। বেহালা বাজাচ্ছেন পিতা সর্বানন্দ। সর্বানন্দ এক সময় বামাচরণকে কৃষ্ণ সাজিয়ে দিলেন। আর বামা নেচে-নেচে মিষ্টি কণ্ঠে গান গাইতে লাগলেন। গাঁয়ের মানুষ বামার কৃষ্ণরূপ দেখে আর গান শুনে অতিশয় আনন্দ পেলেন।

একদিন বামাচরণ জেদ ধরেন শ্মশানে যাবেন। পিতা সর্বানন্দ কিছুতেই থামাতে পারেন না। অবশেষে বামাচরণকে নিয়ে তিনি শ্মশানপুরীতে গেলেন। মহাশ্মশান দেখে বামার মনে ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়। তিনি শ্মশানভূমিকে ভালোবেসে ফেলেন।

এ ঘটনার পর বামা যেন কেমন হয়ে গেছেন। সত্যি সত্যি তিনি ক্ষেপায় পরিণত হন। এ ক্ষেপাটি তাঁর গভীর ধর্ম নিষ্ঠার জন্য। শ্মশানভূমির সাথে, তারামায়ের সাথে তাঁর নিবিড় ভাব গড়ে উঠল। শুরু হলো বামাচরণের শ্মশানলীলা। সে সময় শ্মশানে ছিলেন তন্ত্রসাধক ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ। আরও ছিলেন ব্রজবাসী কৈলাসপতি। কৈলাসপতি বামাকে দীক্ষা দেন। আর মোক্ষদানন্দ দেন সাধনার শিক্ষা। শুরু হলো মহাশ্মশানে বামাচরণের তন্ত্রসাধনা।

এরপর হঠাৎ একদিন পিতা সর্বানন্দের মৃত্যু হয়। বামাচরণের বয়স তখন ১৮ বছর। সংসারের কথা ভেবে মা রাজকুমারী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বামাকে বলেন কিছু একটা করতে। বামা একের পর এক কাজ নেন। কিন্তু কোথাও মন বসাতে পারেন না। তাঁর কেবল তারামায়ের রাঙা চরণের কথা মনে পড়ে। একবার এক মন্দিরে ফুল তোলার কাজ নেন। কিন্তু রক্তজবা তুলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় তারামায়ের চরণযুগলের কথা। আর অমনি তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। কখনো বা ভাবে বিভোর হয়ে গান ধরেন। এক মনে গাছতলায় বসে থাকেন। ফলে তাঁর কোনো কাজই বেশিদিন টেকে না। এভাবেই তিনি বামাক্ষেপা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বামাক্ষেপার এই ক্ষেপামি চলতেই থাকে। তারামায়ের সাধনায় তিনি মন-প্রাণ ঢেলে দেন এবং এক সময় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় নাটোরের মহারানি অন্নদাসুন্দরী তাঁর কথা জানতে পারেন। তারাপীঠের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল তখন নাটোরের রাজপরিবার। তাই রানির নির্দেশে বামাক্ষেপাকে তারাপীঠের পুরোহিত নিয়োগ করা হয়।

বামাক্ষেপা ছিলেন খুবই সহজ-সরল এক আত্মভোলা মানুষ। খাদ্যাখাদ্য, পূজা-মন্ত্র কোনো কিছুই তিনি মানতেন না। 'এই বেলপাতা লে মা, এই অন্ন লে মা, এই জল লে মা, এই ফুল ধূপ লে মা'। এই ছিল বামার পূজা।

বামা তারামায়ের ভক্ত হলেও নিজের মাকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন। মা রাজকুমারী মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ তারাপীঠে আনা হয়। বামা তখন দ্বারকা নদীর ওপারে তারাপীঠ শ্মশানে। বর্ষাকালে নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ। তাই ভয়ে কেউ মৃতদেহ ওপারে শ্মশানে নিতে চাইছে না। এপারেই দাহ করার আয়োজন করছে। কিন্তু মায়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তারাপীঠের শ্মশানেই তাঁকে দাহ করা দরকার। এ কথা ভেবে বামাক্ষেপা মা-তারার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। এপারে এসে মায়ের শরীর নিজের সঙ্গে বেঁধে সাঁতরে ওপারে গেলেন এবং শ্মশানে মায়ের দেহ দাহ করলেন।

বামাক্ষেপা লোকশিক্ষার জন্য বলতেন:

(১) ধর্ম অন্তরের জিনিস, বেশি আড়ম্বর করলে নষ্ট হয়।

(২) মায়াকে জয় করতে পারলেই মহামায়ার কৃপা পাওয়া যায়।

(৩) তারা মা-র করুণা পেলেও মোক্ষ লাভ হয়।

(৪) গুরু, মন্ত্র আর ভগবান– এঁদের মধ্যে পার্থক্য ভাবতে নেই। তোমরাও ভাববে না, তোমাদের মঙ্গল হবে। কলিযুগে মুক্তিসাধনা আর হরিনাম ছাড়া জীবের গতি নেই।

(৫) দিনরাত যে কালীতারা, রাধাকৃষ্ণ নাম করে, পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তন্ত্রসাধনায় অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে বামাক্ষেপা ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

বামাক্ষেপার জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, মনে-প্রাণে কোনো কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়। ধর্ম অন্তর দিয়ে পালন করতে হয়। বাইরে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। দেব-দেবীর পূজায় ভক্তিই প্রধান। মন্ত্র- তন্ত্র, নিয়ম-কানুন প্রধান বিষয় নয়। ভক্তি ভরে মা-তারা এবং রাধা-কৃষ্ণের নাম নিলে পাপ তাকে স্পর্শ করে না। পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

সাধক বামাক্ষেপার এই শিক্ষা আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাব।

একক কাজ : বামাক্ষেপার লোকশিক্ষাসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

নতুন শব্দ : ক্ষেপা, শ্মশান, বেদজ্ঞ, বেঁহুশ, আত্মভোলা, দাহ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. দেবকীর .... গর্ভের সন্তান তোমায় হত্যা করবে।

২. মাকে শোনান .... আর কমলাকান্তের গান।

৩. রাণী রাসমণি তাঁর প্রজাদের .... ন্যায় প্রতিপালন করতেন।

৪. মহাশ্মশান দেখে বামার মনে .... সৃষ্টি হয়।

৫. ক্রমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় .... আশ্রম।

২০২৫

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বামপাশের সাথে মিল কর:

বামপাশ	ডানপাশ
১. পূতনার কথায় যশোদার	কান্না পেল
২. এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের	তন্ত্রসাধনা
৩. তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিমতি স্ত্রী	পশ্যামি
৪. শুরু হলো মহাশ্মশানে বামাচরণের	স্বামী বিবেকানন্দ
৫. যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে	রাসমণি
	মায়া হলো
	শ্রেষ্ঠ শিষ্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. **শিশু কৃষ্ণকে প্রথম মেরে ফেলতে কে গিয়েছিল?**

ক. হিড়িম্বা খ. তাড়কা

গ. পূতনা ঘ. সূর্পণখা

২. **রাণী রাসমণির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি?**

ক. কালীঘাট নির্মাণ খ. জলকর বন্ধ করা

গ. ভবানীপুরে বাজার স্থাপন ঘ. দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন

৩. **বামাক্ষেপাকে তারাপীঠের পুরোহিত নিয়োগ করেন কে?**

ক. রাণী রাসমণি খ. চন্দ্রমণি দেবী

গ. রাজকুমারী দেবী ঘ. মহারানি অন্নদাসুন্দরী

২০১৮

৪. ব্রহ্মানন্দ বলতে বোঝায় -

i. জীবের মধ্যে ব্রহ্মের উপস্থিতি

ii. ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা

iii. জীবের কল্যাণ করে যে আনন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

গোপাল বাবুর ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ খুব বেশি। তাই তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধন পথ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এমনকি অন্য ধর্ম সম্পর্কেও তিনি জানতে চান। তিনি উপলব্ধি করলেন সাকার, নিরাকার কিংবা অন্য যে পথেই সাধনা করা যায়– সবার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন– ঈশ্বর লাভ।

৫. গোপাল বাবুর আচরণে কোন সাধকের আদর্শ ফুটে উঠেছে?

ক. বামাক্ষেপা খ. শ্রীরামকৃষ্ণ

গ. রামকুমার ঘ. লোকনাথ ব্রহ্মচারী

৬. উক্ত সাধকের সাধনতত্ত্বের সাথে গোপাল বাবুর উপলব্ধির মিলটি হলো–

ক. যত মত তত পথ খ. গুরু, মন্ত্র আর ভগবান এক

গ. দেব-দেবীর পূজায় ভক্তিই প্রধান ঘ. ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কল্যাণতম রূপে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. শ্রীকৃষ্ণ কেন মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

২. রাণী রাসমণি জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়ে কী ভূমিকা রাখেন?

৩. বামাক্ষেপা মায়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য কী করেছিলেন?

৪. লোকনাথ কাকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. কংস কর্তৃক শিশুকৃষ্ণকে হত্যার উপায়সমূহ আলোচনা কর।

২. শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনের বর্ণনা দাও।

৩. রাণী রাসমণির জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণ দাও।

৪. লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিতে জীবসেবার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। শান্তিলতা দেবী জনদরদি নারী। তিনি সিটি কর্পোরেশনের একজন মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর সমস্ত অর্থ-সম্পদ মানুষের সেবায় দান করেন। তিনি জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে রাস্তা, নর্দমা সংস্কার ও শিশুদের খেলার মাঠ নির্মাণ করেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা বন্ধ করে দেন। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি মন্দির সংস্কার ও তীর্থ নিবাস স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ক. রাণী রাসমণির মায়ের নাম কী?

খ. রাণী রাসমণির 'রাণী' নাম কীভাবে স্বার্থক হলো? ব্যাখ্যা কর।

গ. শান্তিলতা দেবীর কর্মকান্ডে রাণী রাসমণির কোন কর্মকান্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শান্তিলতা দেবীর মধ্যে রাণী রাসমণির প্রভাব লক্ষ করা যায়– কথাটি মূল্যায়ন কর।

২. সন্তোষ বাবু চাকরির সুবাদে শহরে বসবাস করেন। তাঁর বৃদ্ধ মা-বাবা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। একদিন তার মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে তিনি রাতেই বাড়িতে ছুটে যান এবং দেখতে পান মা মৃত্যু শয্যাশায়ী। তিনি বিলম্ব না করে মাকে কোলে তুলে ডাক্তারের কাছে রওয়ানা হন। কিন্তু খেয়াঘাটে এসে দেখেন নৌকা বাঁধা আছে, মাঝি নেই, বৈঠাও নেই। এ অবস্থায় তিনি মাকে নৌকায় তুলে নদীতে ঝাঁপ দেন এবং রশি দিয়ে টেনে নৌকা ওপারে নিয়ে যান। এরপর ডাক্তার বাড়িতে গেলে ডাক্তারের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় তার মা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ক. তারাপীঠ কোথায় অবস্থিত?

খ. বামাচরণ কীভাবে বামাক্ষেপা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. সন্তোষ বাবুর কর্মের মধ্যে বামাক্ষেপার কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সন্তোষ বাবুর মাতৃভক্তি যেন বামাক্ষেপার মাতৃভক্তির প্রতিচ্ছবি'– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস, স্রষ্টা ও সৃষ্টিসহ কিছু ধর্মীয় কৃত্য এবং হিন্দু ধর্মের আদর্শের মূর্ত প্রতীক অবতার, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবন চরিত সম্পর্কে জেনেছি। আরও জেনেছি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উৎস হিসেবে কিছু ধর্মগুরুর পরিচয়। ধর্মগ্রন্থে তত্ত্বভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে উপাখ্যান থাকে। সে সকল উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে যেভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি।

এ অধ্যায়ে ধর্ম ও নৈতিকতার ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব, হিন্দুধর্মের কতিপয় মূল্যবোধ- জীবসেবা, দয়া, ভক্তি বা শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে এবং পরিবারিক ও সামাজিক জীবনে এসব নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপায় এবং ধূমপান যে একটা অনৈতিক কাজের প্রকার তাও নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্ম ও নৈতিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হিন্দুধর্মের কতিপয় নৈতিক মূল্যবোধ (জীবসেবা, দয়া, ভক্তি বা শ্রদ্ধা কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেম) ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে জীবসেবার অভ্যাস, জীবসেবা, দয়া, ভক্তি বা শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধূমপান অনৈতিক কাজ- একথা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সামাজিক জীবনে নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হব।
- ধূমপান থেকে বিরত থাকব এবং অন্যকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করব।

পাঠ ১ : ধর্ম ও নৈতিকতার ধারণা

ধর্ম

আমরা জানি যা ধারণ করে, তাকে ধর্ম বলে। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, সমুদ্র-নদী, পাহাড়-পর্বত-মরুভূমি– সবকিছুকে ধর্ম ধারণ করে আছে। আবার ধর্ম শব্দটির একটি অর্থ ন্যায়বিচার ও জীবনাচরণের বিধি-বিধান। আমাদের ধর্ম মেনে চলতে হবে– এ কথার অর্থ হলো আমাকে জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। ন্যায়বিচার করতে হবে। অন্যদিকে ধর্ম হলো কোনো জীব বা বস্তুর গুণ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন- আগুনের ধর্ম দহন করা। মানুষেরও নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। তার নাম মনুষ্যত্ব বা মানবতা। এছাড়া যা থেকে মোক্ষলাভ হয়, তার নামও ধর্ম।

সুতরাং বলা যায়- যে বিশেষ গুণ, যা আমাদের ধারণ করে, যার অনুশীলন দ্বারা জীবের কল্যাণ হয় এবং নিজের মোক্ষলাভ হয়, তার নাম ধর্ম।

'মনুসংহিতা' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে– মানুষের ধর্মের বা মনুষ্যত্বের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে। যেমন– অহিংসা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, দেহ ও মনে শুচি বা পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সৎপথে থাকা।

একক কাজ : * ধর্মশব্দটির বিভিন্ন অর্থের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
* ধর্মের পাঁচটি লক্ষণের নাম লেখ।

নৈতিকতা

যে-কাজ করলে মঙ্গল হয়, কারও কোনো ক্ষতি হয় না, সে কাজ হচ্ছে ভালো কাজ। যেমন, আমার যোগাসন করি। এতে আমাদের শরীর ও মনের উপকার হয়। আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু অন্য কারও ক্ষতি হয় না। এটা ভালো কাজ।

আবার আমি অন্যের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করলাম। সম্প্রীতির ভাব বজায় রেখে সমাজে চললাম। তা হলে কী হবে? তাহলে আমার এবং আমার পাশাপাশি সমাজের সকল মানুষের মঙ্গল হবে। এটা ভালো কাজ। অন্যদিকে মিথ্যা কথা বললে চরিত্র নষ্ট হয়, পাপ হয়। এতে অন্যের অমঙ্গল হয়। সুতরাং মিথ্যা কথা বলা মন্দ কাজ এবং মহাপাপ। আমরা এটা করব না।

কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার জ্ঞানকে বলে 'নীতি'। আর 'নৈতিকতা' বলতে বোঝায় ভালো কাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝে ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ না করার মানসিকতা। নৈতিকতা একটি চারিত্রিক গুণ। নৈতিকতা একটি মূল্যবোধ।

দলীয় কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে দেবেন। একটি দল একটি নৈতিক গুণের কথা বলবে। অন্যদল আরেকটি বলবে। এরকম পাঁচবার চলবে। প্রতিবারের জন্য ১ পয়েন্ট। যারা বেশি পয়েন্ট পাবে, তারা বিজয়ী হবে।

নতুন শব্দ : দহন, সম্প্রীতি, উদ্বুদ্ধ, মূল্যবোধ, অনুশাসন, নৈতিকতা।

পাঠ ২ : নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব

নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে। মানুষের মঙ্গলের কথা বলে। নৈতিক মূল্যবোধও সেই একই কথা বলে।

হিন্দুধর্মের শিক্ষায়, উপদেশে ও অনুশাসনে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। জীবকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া হয়। এ জীবসেবা হিন্দুধর্মের অঙ্গ, হিন্দুধর্মের শিক্ষা। আবার জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ। একটি নৈতিক মূল্যবোধ।

অহিংসা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচিতা বা দেহ-মনের পবিত্রতা এবং সৎপথে থাকা- ধর্মের এ পাঁচটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

হিন্দুধর্মতত্ত্ব নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের সহায়ক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত ধর্মীয় উপাখ্যান সমূহ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

হিন্দুধর্মের উপদেশ-অনুশাসন মেনে চললে এবং ধর্মীয় উপাখ্যান সমূহের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করলে জীবন হবে ধর্মীয় চেতনায় দীপ্ত এবং নৈতিক শিক্ষায় উজ্জ্বল। আর সে উজ্জ্বলতায় সমাজ হবে উদ্ভাসিত।

হিন্দুধর্মের নানা প্রতীকে, পূজার উপকরণেও রয়েছে নৈতিকতার প্রতীকী প্রকাশ। দুর্গাপূজার সময় সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কণে, হলুদ, আবির, বেলপাতাগুড়ো প্রভৃতি রঙ ব্যবহার করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে শিল্পচেতনার। 'স্বস্তিকা' চিহ্ন শান্তির প্রতীক। 'চক্র' ন্যায় বিচারের প্রতীক। অন্যায়কে ধ্বংস করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাহসের প্রয়োজন। চক্র সাহসের চিহ্ন। শঙ্খ মঙ্গলের প্রতীক। একসঙ্গে শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে আহ্বান জানানো হয় : তোমরা এসো, এক হও, এক হয়ে মাঙ্গলিক কাজে অংশ নাও।

একক কাজ : নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের পাঁচটি প্রভাব লেখ।

নতুন শব্দ : শুচিতা, প্রদত্ত, জাগ্রত, দীপ্ত, উদ্ভাসিত

পাঠ ৩ : জীবসেবা

আমরা কিছু কাজ করি, নিজের মঙ্গলের জন্যে বা নিজের আনন্দের জন্যে। আবার আমরা এমন কিছু কাজ করি যাতে অন্যের মঙ্গল হয়, অন্যের আনন্দ হয়। অন্যের মঙ্গল বা অন্যের আনন্দের জন্য যে কাজ করা হয় তার নাম 'সেবা'।

সেবা নানা ভাবে করা যায়। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল, আমরা তার শুশ্রূষা করলাম। একে বলতে পারি রোগীর সেবা। বাড়িতে অতিথি আসলেন, তার যত্ন করলাম। একে বলা হয় অতিথি সেবা। সেবার একটি অর্থ উপাসনা করা, তাকে বলে ঠাকুর সেবা।

বাড়িতে গুরুজন কেউ এলে মা বলেন 'সেবা দে'। এখানে সেবা মানে প্রণাম করা, শ্রদ্ধা জানানো। কেউ না খেয়ে আছে, তাকে খেতে দেওয়াকেও বলা হয় সেবা। আমরা যে আহার গ্রহণ করি, তাকেও বলা হয় সেবা। জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা যে কাজ করি, তার নাম জীব সেবা। সমাজের মঙ্গল হয় এমন কাজকে বলা হয় সমাজ সেবা।

আবার হিন্দু ধর্মতত্ত্বে এ সেবা কথাটি খুবই গভীর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের একটি বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তার দ্বারা আমাদের ভেতর আত্মারূপে যে ঈশ্বর বাস করেন, তাঁর সেবা করি। জীব সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা হয়ে যায়। জীবসেবা যেমন ধর্মের দিক থেকে আচরণীয়, তেমনি নৈতিকতার দিক থেকেও পালনীয় গুণ।

আমরা ধর্মীয় উপাখ্যান থেকে জেনেছি, পুরাকালে রন্তিদেব অযাচক ব্রত পালনের সময় আটচল্লিশ দিন অভুক্ত থাকার পর খাদ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজে অভুক্ত থেকে ক্ষুধার্তদের সেবা করেছিলেন।

কেবল এ উপাখ্যানই নয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে জীবসেবার এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নতুন শব্দ : শুশ্রূষা, উপাসনা, আচরণীয়, অযাচক ব্রত।

পাঠ ৪ : দয়া

কারও কষ্ট দেখলে মন কাঁদে। তার কষ্ট দূর করে দিতে ইচ্ছা হয়। মনের এ ভাবকে বলা হয় দয়া।

২০১৮

দয়া একটি নৈতিক গুণ। সমাজের জন্য একটি প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি হচ্ছে দয়া। দয়া করা হয় কাকে? যে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে, তাকে খাদ্য দিয়ে আমরা দয়া করি।

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। তাই জীবকে দয়া করলে, জীবের দুঃখ দূর করলে, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। ঈশ্বর নিজেই দরিদ্ররূপে ঘুরে বেড়ান দয়া পাবেন বলে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

'জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। ভগবানের নামে রুচি, জীবের প্রতি দয়া এবং বৈষ্ণবরূপে মানুষের সেবা করাকে তিনি সনাতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তার শিক্ষা হচ্ছে :

'নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন।
ইহা হৈতে ধর্ম আর নাহি সনাতন।।'

মোটকথা, দয়ার প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়। দয়ার দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, রাজা হরিশ্চন্দ্র, মহাবীর কর্ণ প্রমুখ দয়ার বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরাও আমাদের জীবনে ও সমাজে দয়ার আদর্শের প্রতিফলন ঘটাব।

একক কাজ : নিজের বা অন্যের জীবন থেকে জীবসেবা ও দয়ার দুটি করে ঘটনা উল্লেখ কর।

নতুন শব্দ : প্রবৃত্তি, রুচি, সহানুভূতিশীল, প্রতিফলন।

পাঠ ৫ : ভক্তি বা শ্রদ্ধা

ভক্তি বা শ্রদ্ধা একটি নৈতিক গুণ এবং তা ধর্মেরও অঙ্গ।

আমরা মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করি। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করি। যারা আমাদের গুরুজন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি। আর গুরুজনেরা আমাদের স্নেহ করেন।

১৩০৫

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বড়দের প্রতি ছোটদের যে শিষ্টাচার তাকে বলে শ্রদ্ধা। ছোটদের প্রতি বড়দের যে মমতামাখা আচরণ, তার নাম স্নেহ।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমার্থক। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। ভক্তি হচ্ছে ভক্তির পাত্রের প্রতি চরম অনুরাগ। শ্রদ্ধা যখন গভীর হয়, তখন তাকে বলে ভক্তি।

আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি করি। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের পালন করেন। তিনি নানাভাবে আমাদের মঙ্গল করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দুভাবে প্রকাশ করা যায়।

এক. সরাসরি ঈশ্বরের নাম জপ, নাম কীর্তন ইত্যাদি মাধ্যমে।

দুই. আমাদের মা-বাবা-শিক্ষকসহ গুরুজনদের ভক্তি করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির প্রকাশ ঘটে।

আমরা দেব-দেবীদের বিশেষ গুণ ও শক্তি অর্জনের জন্যে তাঁদের ভক্তি করি। পূজার মধ্য দিয়ে দেবতাদের প্রতি আমাদের ভক্তি প্রকাশ পায়।

আমরা জানি, ঈশ্বর যখন ভক্তকে কৃপা করেন, তখন তাঁকে ভগবান বলে। ভক্ত যেমন ভগবানকে ভক্তি করেন, তেমনি ভগবানও ভক্তকে দেখে রাখেন। তাই তো বলা হয়, 'ভক্তের ভগবান' কিংবা 'ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন।'

ভক্ত সুখ ও দুঃখকে একইভাবে গ্রহণ করেন। কর্মের ফলের দিকে না তাকিয়ে কেবল কর্তব্যকর্ম করে যান। তিনি সহিষ্ণু, পরদুঃখকাতর। পরের সুখে সুখী হন। অন্যের দুঃখে দুঃখী হন। কেউ তাঁর পর নয়। সকল মানুষকে তিনি আপন ভাবেন।

তিনি নিজে ও তাঁর সকল কাজ ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। অর্থাৎ তাঁর সকল কাজ ঈশ্বরের কাজ। তিনি শুধু কাজটি সম্পাদন করছেন।

ভক্তের এই ফলের আশা না করে কর্তব্য পালন করে যাওয়া, সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করা, পরোপকার, সহিষ্ণুতা, অহিংসা প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলো যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

ভক্তিতে ব্যক্তির মুক্তি আর সমাজেরও মঙ্গল।

ধর্মীয় উপাখ্যানে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, অর্জুন, রাজা রন্তিদেব প্রমুখের ভক্তির কাহিনী উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আবার দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে শবর শ্রেণির এক কন্যা শবরীর ভক্তির উপাখ্যান দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে।

একক কাজ : তুমি তোমার মা-বাবা ও গুরুজনদের প্রতি কীভাবে ভক্তি প্রদর্শন কর।

নতুন শব্দ : শিষ্টাচার, সমার্থক, অনুরাগ, জপ, সহিষ্ণু, পরদুঃখকাতরতা, সমর্পণ, দেদীপ্যমান

পাঠ ৬ : কর্তব্যনিষ্ঠা

আমরা আমাদের পরিবারে ও সমাজে নানা রকমের কাজ করি। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষার্থী, তাদের কাজ কী? এর উত্তর হবে : ভালো করে লেখাপড়া করা এবং জ্ঞান অর্জন করা। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের নিজেদের কাজ যত্নের সঙ্গে করতে হয়। সমাজেও মানুষকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হয়। সে কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে গোটা সমাজেরই ক্ষতি হয়।

আমরা নিশ্চয়ই লেভেলক্রসিং দেখেছি। রেল লাইন আর সড়ক যেখানে একে অন্যকে ভেদ করে চলে গেছে, সেই জায়গাটাকে বলে লেভেলক্রসিং।

ট্রেন আসার আগেই ঠিক সময় রেল লাইন ভেদ করে যাওয়া সড়কটি দুপাশ থেকে প্রতিবন্ধক দন্ড ফেলে বন্ধ করে দিতে হয়। এ জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী আছেন। তিনি ট্রেন আসার ঠিক আগে প্রতিবন্ধক ফেলে সড়ক পথ বন্ধ করলেন না। তা হলে কী হবে? সড়ক দিয়ে গাড়ি চলতে থাকবে, লোকজন চলতে থাকবে। ট্রেনও এসে পড়বে।

তাতে ঘটবে দুর্ঘটনা। তাই লেভেলক্রসিং- এ প্রতিবন্ধকতা ফেলার এবং ওঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর কর্তব্যনিষ্ঠার ওপর যানবাহন ও জনগণের চলাচলের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

একথা জীবন ও সমাজের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণ করে চলব। এর দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবন সুন্দর হবে এবং সমাজে থাকবে শৃঙ্খলা ও শান্তি। জীবন ও সমাজ হবে আনন্দময়।

আরুণির কর্তব্যনিষ্ঠার উপাখ্যানটি আমরা পড়েছি। সেই যে ধৌম্যের শিষ্য আরুণি। তিনি গুরুর আদেশে ক্ষেতের আল বেঁধে বর্ষার জল আটকাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জল আটকানোর জন্য আল বাঁধতে না পেরে নিজেই আল হয়ে ক্ষেতের পাশে শুয়েছিলেন।

আরুণির এ কর্তব্যনিষ্ঠার উপাখ্যান ধর্মগ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আর আমাদের যেন ডেকে বলছে, 'তোমরাও আরুণির মতো কর্তব্যনিষ্ঠ হও।'

একক কাজঃ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কর্তব্যনিষ্ঠার প্রভাব লিখ।

নতুন শব্দ : লেভেলক্রসিং, প্রতিবন্ধক, আল।

পাঠ ৭ : ভ্রাতৃপ্রেম

কাজল আর সজল। দুই ভাই। দুজনে খুব মিল। কাজলের খুশিতে সজল খুশি হয়। সজলের খুশিতে কাজল খুশি হয়। আবার কাজল কষ্ট পেলে সজল কষ্ট পায়। সজল কষ্ট পেলে কাজল কষ্ট পায়। এই যে কাজল ও সজলের একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা বা মমতা, একেই বলে ভ্রাতৃপ্রেম।

আমাদের পরিবারে ও সমাজে ভ্রাতৃপ্রেম খুবই দরকারি একটি নৈতিক গুণ। যে সকল নৈতিক গুণের জন্যে পরিবার শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় থাকে, সেগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম একটি। আর প্রতিটি পরিবার শান্তিপূর্ণ থাকলে গোটা সমাজও শান্তিপূর্ণ থাকবে।

আমরা জানি, রামায়ণে রাম-সীতা যখন চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যান, তখন লক্ষণও রাজ প্রাসাদের ভোগ বিলাস ত্যাগ করে রামের সঙ্গে বনে যান। ভ্রাতৃপ্রেমের কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত। একইভাবে ভরত রাজ্য শাসনের ভার পেয়েও রামকে ফিরিয়ে আনতে যান। রাম ফিরলেন না। ভরত তাঁর পাদুকা সিংহাসনে রেখে নিচে বসে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। আমরা জানি, রাম ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভরত রাজ্যভার ফিরিয়ে দিলেন। তাই ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম উজ্জ্বল হয়ে আছে।

লক্ষণ আর ভরতের এ ভ্রাতৃপ্রেম রামায়ণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের এ ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত আমরাও অনুসরণ করব। তাহলে আমাদের পরিবার ও সমাজ শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হবে।

পাঠ ৮ : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপায়

'শৃঙ্খলাবোধ' নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের অন্যতম উপায়। ঈশ্বর জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রয়েছে। তেমনি আমরাও আমাদের জীবনে আনব শৃঙ্খলাবোধ। ঈশ্বরের শৃঙ্খলাবোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। আমরাও আমাদের নিজেদের জীবনে ও আচরণে শৃঙ্খলা বোধের প্রকাশ ঘটাব।

পারিবারিক জীবনে একটি পরিবারের সদস্যগণ পরস্পরের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িত। তাই নিজের অধিকার ভোগ করার সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। এ সত্য আমরা যেন ভুলে না যাই।

সমাজের ক্ষেত্রেও সমাজের সকল সদস্যের এককভাবে এবং সম্মিলিত ভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। আর তা করতে গিয়েই কতগুলো নৈতিক মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটেছে। যেমন- সততা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, সেবা, সৌহার্দ্য, একতা, সত্যবাদিতা, জীবসেবা, দয়া, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধ।

ধর্মও সকল নৈতিক মূল্যবোধকে তার উপদেশ ও অনুশাসনে পরিণত করেছে। হিন্দুধর্মগ্রন্থে ধর্মের যে দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে অহিংসা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ বা রাগ না করা, ধীশক্তি, বিদ্যা, সংযম ইত্যাদি। যিনি ধার্মিক, তিনি এগুলো পালন করেন। আর এভাবেই নৈতিক মূল্যবোধ পরিণত হয় ধর্মীয় অনুশাসনে। আবার ধর্মীয় অনুশাসন থেকে তৈরি হয় নৈতিক মূল্যবোধ।

নিজের মুক্তি বা মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণ- এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের একটি মূল কথা।

জীবকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে আর কোনো সংকীর্ণতা থাকতে পারে না। কারণ ঈশ্বরকে ভক্তি করা, তার সেবা করা আমাদের ধর্মীয় তথা নৈতিক কর্তব্য। সততা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, দয়া-মায়া-স্নেহ প্রভৃতি সূত্রে যদি গোটা পরিবার বাঁধা থাকে, তাহলে পারিবারিক জীবন নৈতিকতায় মন্ডিত হবেই।

সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। সমাজ ও জীবনকে সত্য, সুন্দর ও শান্তি মন্ডিত করা নৈতিকতার লক্ষ্য। ধর্মও তাই। সুতরাং ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিকতা অনুসরণ এবং অনুশীলন করে আমরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন করতে পারি।

দলগত কাজ: নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপায় লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : ধীশক্তি, সৌহার্দ্য, সংকীর্ণতা, মন্ডিত।

পাঠ ৯ : ধূমপান অনৈতিক কাজ

আমরা এতক্ষণ কিছু নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন একটি অনৈতিক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এসো, আমরা ভালোর পাশাপাশি মন্দকেও চিনে রাখি। আলোর বিপরীতে যেমন থাকে অন্ধকার, তেমনি নৈতিকতার বিপরীতে লুকিয়ে থাকে অনৈতিক কাজের হাতছানি।

ধূমপানের কথাই ধরা যাক। আমাদের চারপাশে এতো লোক ধূমপান করে যে, আমাদের মনেই হয় না কাজটি খুবই অনৈতিক। ধূমপানের কথায় উঠে আসে মাদকাসক্তি প্রসঙ্গ। মাদক বলতে এমন কিছু জিনিসকে বোঝায় যা আমাদের নেশাগ্রস্ত করে।

আমাদের দেহ ও মনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসুস্থ করে তোলে। এমনকি মাদকসেবী মারা পর্যন্ত যায়।

ধূমপানও এক ধরনের মাদকাসক্তি।

ধূমপান বলতে বোঝায় বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, তামাক ইত্যাদিতে বিশেষভাবে আগুন ধরিয়ে সেগুলোর ধূম বা ধোঁয়া পান করা।

ধূমপানকে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বিষপান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ বিড়ি সিগারেট তামাক বা চুরুটের ধোঁয়ায় থাকে 'নিকোটিন' জাতীয় পদার্থ। এ পদার্থ বিষ। এ বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে মানুষের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ হয়। ধূমপানের মধ্য দিয়ে নিকোটিন জাতীয় বিষ শরীরে প্রবেশ করে। তাতে শরীর ও মনের খুবই ক্ষতি হয়।

চিকিৎসকগণ বলেন, ধূমপানের ফলে শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যানসার, গ্যাসট্রিক-আলসার, ক্ষুধামন্দা, হৃদরোগ ও মানসিক অবসাদসহ অনেক ধরনের রোগ হয়।

এসব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অকালমৃত্যুও ঘটে। অন্যদিকে ধূমপায়ী ব্যক্তি শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না, অন্যদেরও নানাভাবে ক্ষতি করে। ধূমপানের সময় তার চারপাশের শিশু, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক সকলেই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একে পরোক্ষ ধূমপান বলা হয়, যা অধূমপায়ীদের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর।

ধূমপান একটি বদভ্যাস। একটি দুর্বার ও ক্ষতিকর নেশা।

হিন্দুধর্মে সকল প্রকার নেশাকেই শুধু নয়, নেশাগ্রস্তের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকেও মহাপাপ বলা হয়েছে।

তাছাড়া এ দেহ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। একে পবিত্র রাখব। এমন কিছু করব না যাতে নিজের কিংবা অন্যের শরীর ও মনের ক্ষতি হয়।

এসো, আমরা প্রতিজ্ঞা করিঃ

'রাখব উঁচু নিজের মান,
করব নাকো ধূমপান।
মনে রাখি কথাখান,
ধূমপানে বিষ পান।
ধূমপানকে না বলব,
নীতিধর্ম মেনে চলব।'

দলীয় কাজঃ ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : চুরুট, নিকোটিন, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, সংস্পর্শ, দুর্বার।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১) মানুষের নিজস্ব ধর্ম ………………… ।

২) পরের কষ্ট দূর করার প্রবৃত্তির নাম …………….. ।

৩) নীতি হচ্ছে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ ………….. করার জ্ঞান ।

৪) রাজা রন্তিদেব ………….. ব্রত পালন করেছিলেন ।

৫) শৃঙ্খলাবোধ হচ্ছে ……………. গঠনের অন্যতম উপায় ।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বামপাশ	ডানপাশ
১. ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের	বৈষ্ণব সেবন
২. জীবের মধ্যে আত্মারূপে	মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়
৩. নামে রুচি জীবে দয়া	ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন
৪. দয়ার প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের	গভীর সম্পর্ক রয়েছে
	ঈশ্বর আছেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. **মানুষের ধর্মের বা মনুষ্যত্বের কয়টি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে?**

ক. ২ খ. ৩

গ. ৫ ঘ. ১০

২. **শ্রদ্ধা যখন গভীর হয় তখন তাকে কী বলে?**

ক. স্নেহ খ. দয়া

গ. ভক্তি ঘ. শিষ্টাচার

৩. **নৈতিকতা বলতে বোঝায়-**

i. ভালো কাজ করার মানসিকতা

ii. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা

iii. অন্যের অমঙ্গল না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী কণার বাড়ির পাশে একটি বিড়াল ছানা অসহায়ভাবে পড়ে আছে দেখে তার মায়া হয়। সে এটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং আদর যত্নে বড় করে তোলে। বিড়ালটি এখন কণার খুবই ভক্ত।

৪. কণার আচরণে কোন নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে?

ক. ভক্তি খ. শ্রদ্ধা

গ. জীবসেবা ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা

৫. কণার উক্ত আচরণের অন্তর্নিহিত সারকথা হলো-

ক. ভক্তিই মুক্তির পথ খ. শ্রদ্ধাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ

গ. জীবসেবাই ঈশ্বরের সেবা ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা মানুষকে মহান করে তোলে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ধর্ম বলতে কী বোঝ?

২. নৈতিকতা বলতে কী বোঝ?

৩. কর্তব্য নিষ্ঠার ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৪. ভক্তির ধারণা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. হিন্দুধর্ম অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের মূলকথা- ব্যাখ্যা কর।

৩. সদাচরণের মূলেই রয়েছে ভক্তি-শ্রদ্ধা- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

৪. জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।

৫. ভ্রাতৃপ্রেম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। প্রণববাবু শিক্ষকতা করেন। তার স্ত্রী ব্যাংকে চাকুরি করেন। তাদের দুটি ছেলে মেয়ে। প্রণববাবু ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে রিপনকে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর রিপন অসুস্থ হয়ে পড়লে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এমন রোগের কথা শুনে প্রণববাবুর স্ত্রী রিপনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু প্রণববাবু তা না করে রিপনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সকলকে সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শ দেন।

ক. যা আমাদের ধারণ করে তাকে কী বলে?

খ. নৈতিকতা ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রণব বাবুর আচরণে কোন নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'প্রণববাবুর পরামর্শটি ছিল যৌক্তিক'- উক্তিটি তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। শোভন সবসময় লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল। হঠাৎ কিছু দুষ্টু ও খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে ধূমপান শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য মাদকে আসক্ত হয়। এতে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এবং পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না। এদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় তার বাবাকে তার আচরণ ও লেখাপড়ার অবনতির কথা জানালে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনিও প্রধান শিক্ষক মহোদয় শোভনকে এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। এতে শোভন সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং মাদক কে 'ঘৃণা' ও 'না' বলার অঙ্গীকার করে।

ক. ধর্মীয় দৃষ্টিতে ধূমপান কী ধরণের কাজ?

খ. ধূমপানকে কেন বিষপান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. শোভনের কোন ধরনের শারীরিক ক্ষতি হতে পারে- তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শোভনের অঙ্গীকারটি তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত প্রতিজ্ঞা ছড়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ–হিন্দুধর্ম শিক্ষা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।

– শ্রী রামকৃষ্ণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।